যৌবরাজ্য

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড

এলাহাবাদ

১৯২৯

দেড় টাকা

প্রকাশক :—
শ্রীকালীকিঙ্কর মিত্র
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস লিমিটেড
এলাহাবাদ

প্রিণ্টার :—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ বসু
ইণ্ডিয়ান্ প্রেস্ লিমিটেড
বেনারস-ব্র্যাঞ্চ

আবাল্যবন্ধু

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কবকমলেষু—

চৈত্র, ১৩৩৫

সূচী

অরসিকেষু	...	...	...	১
স্বামী-স্ত্রী	...	...	...	২৯
অন্দর ...	...	...	...	৫৭
জীবনের বসন্ত	...	...	...	৬৮
তেরস্পর্শ	..	...	...	৮০
দিনের আলোয়	...	...	...	৯৫
ফ্রী-পাশ	...	...	...	১০৪
বিজ্ঞাপনের ফল	...	...	...	১১২
দাম্পত্য-কলহে চৈব	...	...	...	১৩৮
একটি ব্যাগের কাহিনী		...	...	১৬৭
বহ্বারম্ভ		...	...	১৭৫

লেখকের লেখা অন্য বই

উপন্যাস

আঁধি	২॥০	দবদী ২য় সংস্কবণ···	১৲
পিয়ারী ···	২৲	সোনাব কাঠি···২য় সংস্করণ	১৲
কুজ্ঝটিকা ···	২৲	প্রেয়সী ৪র্থ সংস্কবণ	১৲
নিরুদ্দেশেব যাত্রী ··	১॥০	মাতৃঋণ	১॥০
কাজরী ২য় সংস্কবণ	১॥০	নবাব	২॥০
স্ত্রীবুদ্ধি ·	১৸০	বন্দী···২য় সংস্করণ ···	১৲
বাব্‌লা ···	১॥০	রূপছায়া ·	২৲
মুক্ত পাখী ···	২৲	মরুমায়া ···	১৲
লাল ফুল	২৲	নেপথ্যে	॥০
ছোট পাতা	১॥০	পথেব পথিক ···	৷৵০
গরীবেব ছেলে ···	১॥০	অকলঙ্ক চাঁদ ··	১॥০

ছোট গল্প

শেফালি ২য় সংস্কবণ	৸০	তরুণী	২৲
নিঝব ২য় সংস্কবণ	১৲	পিয়াসী ···	১।০
মণিদীপ	১৲	মৃণাল	১।০
পুষ্পক	১৲	বৈকালি	॥০
পরদেশী ২য় সংস্করণ	১৲	চাঁদমালা ···	১৲

ছেলেমেয়েদের গল্প-উপন্যাস

লাল কুঠি (সচিত্র উপন্যাস)	১৲	ফুলের পাখা	॥০
মা-কালীব খাঁড়া (উপন্যাস)	১৲	তাবার মালা ···	॥০
সাঁঝের বাতি	॥০	ময়ুবপুচ্ছ ···	॥০

বনের পাখী ··· ॥০

নাট্যগ্রন্থ

লাখ টাকা…ষ্টারে অভিনীত ১৲

যৎকিঞ্চিৎ…ষ্টারে অভিনীত ৷৷৹

দশচক্র…ষ্টারে অভিনীত ৷৵৹

পঞ্চশর ‥ষ্টারে অভিনীত ৷৵৹

দরিয়া ‥মিনার্ভায় অভিনীত ৷৷৹

রুমেলা…মিনার্ভায় অভিনীত ৷৷৹

হাতের পাঁচ…মিনার্ভায় অভিনীত ‥ ৷৴৹

শেষ-বেশ…ষ্টারে অভিনীত … ৷৴৹

গ্রহের ফের ‥কোহিনুরে অভিনীত … ৷৹

সকল গ্রন্থই কলিকাতার ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস; গুরুদাস লাইব্রেরী; এম্ সি সরকার এণ্ড সন্স; বরেন্দ্র লাইব্রেরী ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে; এবং ৮২।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

যৌবরাজ্য

—— · · ——

অরসিকেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবুজ সাহিত্য

সুরো ছেলেটির বয়স তেরো পার হইয়াছে। সে জেলা স্কুলের থার্ড ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় চাড় তত না থাক্, পার্থিব বিষয়ে জ্ঞান-সঞ্চার তার এই বয়সেই যা হইয়াছে, তা প্রচুর। থাকে সে ভাগলপুরে, সেখানকার জল-হাওয়া ভালো। একে এই জল-হাওয়া, তায় উর্ব্বর প্রাণ, নবযুগের সবুজ সাহিত্য কাজেই ডিমাই, ডবল-ক্রাউন প্রভৃতি নানা আকারের মাসিক-পত্রের মারফৎ সে-প্রাণে ভাবের শস্য ভালো করিয়া গজাইয়া তুলিয়াছে।

তাদের একটা ক্লাব আছে। সে ক্লাবে কলিকাতার থিয়েটারের নাট্য-সাহিত্য হইতে সুরু করিয়া মিশরের প্রাচীন ইতিহাস লইয়াও নাড়াচাড়া চলে। নবযুগের ডিমোক্রেটিক সাহিত্যের চর্চ্চা যে ভালো করিয়াই হয়, সে-কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

বাড়ীতে মাসিক-পত্রও আসে অনেকগুলি। সুবোর বাপ জলধিনাথ চাটুয্যে ভাগলপুরের মস্ত উকিল। অগাধ পয়সা এবং তাঁর অনেকগুলি পয়সা বাংলা-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে অন্দর হইতে ব্যয় করা হয়। তাঁর মেজো মেয়ে শুকতারা মিশন স্কুলে ম্যাট্রিক পড়িতেছে। তরুণ সাহিত্যের এই ঘূর্ণী তাকে কেন্দ্র করিয়া পাড়ার অনেকগুলি তরুণীকেও এদিকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই ঘরে-বাহিরে সাহিত্য-রসের জোগান পাইয়া সুবোর তরুণ মনে সবুজ রঙের ছোপ লাগিবার পক্ষে ভালো রকমই সুবিধা ঘটিয়াছে।

ক্লাবে সে দিন আলিবাবার রিহার্শাল চলিয়াছিল। সুবো মর্জ্জিনা সাজিবে। তাকে হাবভাব শিখাইতে মোশন-মাষ্টারকে বেশী বেগ পাইতে হইল না। সাহিত্যের কল্যাণে মনস্তত্ত্ব ব্যাপারে সে নেহাৎ অজ্ঞ ছিল না। বেচারা জলধিনাথ মক্কেল লইয়া সর্ব্বক্ষণ এমন ব্যস্ত থাকিতেন যে, পোষ্যবর্গের নানা অভাব-অভিযোগের দিকে দুই হাতে পয়সা ঢালিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত মনে ভাবিতেন, ওদিককার কর্ত্তব্য ঠিক সারা হইয়া গেল,—খুঁটিনাটী দেখিবার আর প্রয়োজন নাই। আসল কথা, প্রয়োজনের কথা ভাবিবার তাঁর অবসরও ছিল না।

হুসেনের সঙ্গে মর্জ্জিনার প্রণয়ের দৃশ্যটা রিহার্শাল দিয়া সুবো যখন গৃহে ফিরিল, রাত তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। জলধিনাথ বাহিরের ঘরে বসিয়া মোটা একখানা আইনের কেতাবের পাতায় এমন মশ্‌গুল যে, সুবোর দিকে তাঁর নজরও পড়িল না। সুবো আসিয়া একেবারে দোতলায় নিজের পড়ার ঘরে হাজির হইল। আলোটা জ্বালিয়া গুন্ গুন্ করিয়া সে গান গাহিতেছিল—

আমি ঢের সয়েছি, আর তো সবো না,
তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন
যেচে পরবো না। ....

গাহিতে গাহিতে সে টেব্‌ল্‌টা গুছাইতে লাগিল্‌। পড়ার বইগুলা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ব্লটারটার উপর কে দোয়াত উপুড় করিয়া দিয়াছে! সর্ব্বনাশ! তার মর্জ্জিনার পার্ট-লেখা কাগজখানা মসীলিপ্ত! পাশে অ্যালজেব্রার মলাটখানারও সেই দশা! ট্রান্সলেশনের খাতা খোলা ছিল, তার পাতার উপরও কালীর ঢেউ ছুটিয়াছে। কাল সকালে ক্লাশে দেখাইতে হইবে! টীচার ঈশানবাবু খাতা দেখিয়া যা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিবেন! রাগে সে জ্বলিয়া উঠিল, উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল,—ভিখনা…

কোনো সাড়া নাই। আবার সে হাঁকিল,—ভিখনা…

—যাই দাদাবাবু…জবাবের সঙ্গে সঙ্গে ভিখনা আসিয়া হাজির। সুরো টেব্‌লের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল,—কে এ কাজ করলে?

ভিখনা টেব্‌লের দিকে চাহিয়া কহিল,—সাফ করতে আসতেছিনু …মেজদিদিমণি লিখাপড়া করছিলেন। আলো বাটিয়ে ওঠে, কমাতে গিয়ে দোয়াত উল্টিয়ে দেছেন…হামায় বললেন, হামি আসতেছিনু…

টেব্‌লের নীচে কখানা লেখা কাগজ…সুরো কহিল,—সব সাফ কর্‌…

ভিখনা টেব্‌ল্‌ সাফ করিতে উদ্যত হইল। সুরো লেখা কাগজগুলা লইয়া দেখিতে লাগিল। এটা বাজারের হিসাব…পেট্রোলের একটা রসিদ, একখানা পুরানো প্রেসক্রুপসন, ফর্ম্মামিণ্টের ছাপা বিজ্ঞাপন… এটা…? একখানা চিঠির টুকরা…এ যে মেজদির হাতের লেখা! তাই তো, কাকে লিখিয়াছে…?

সুরো পড়িতে লাগিল,—মেজদি লিখিয়াছে—

কাল সে আসচে। আমার তরুণ প্রাণে দুরন্ত ঝড়ের মত…সেখানে যত সাধ, যত আশা ঝড়ীন ফুলের মত ফুটে বর্ণে-গন্ধে আমায় বিভোর করে রেখেচে, সে স

সে এসে মত্ত হস্তে ছিঁড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে! একটা দুরন্ত দৈত্য, একটা বৃদ্ধ শয়তান··· !

··· আমি তোকে ভালোবাসবো? কখনো না। জোর করে বাপ-মা তার হাতে আমার এ তরুণ প্রাণ সঁপে দিতে চান্! হায় রে, প্রাণের উপর এ শাসন চলে কখনো? আর যার চলুক, আমার নয়। আমি চলতে দেবো না। তার হাতে এ তরুণ প্রাণ তুলে দেবার আগে...বিষ! ঠিক! বিষের বাটি মুখে তুলে এ প্রাণ শেষ করে দেবো...! তরুণীর প্রণয় চায় এই গর্দ্দভ...? এই গলিত জীর্ণ...

এইটুকু! এর পরের অংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছে! এটুকু পড়িয়া স্বরো দুনিয়া ভুলিয়া গেল! মেজদির বিবাহের কথা চলিতেছে, এ খপর তার অবিদিত নয়। কিন্তু এমনি একটা বর্ব্বর বরের সহিত? ···আবার সে এখানে আসিতেছে—কালই! মেজদি তাই তার কোনো সখীকে বুঝি এই চিঠিতে প্রাণের বেদনা জানাইয়াছে! বিষ! সর্ব্বনাশ! স্বরোর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! সে ভাবিল, ভাগ্যে এ চিঠিখানা সে দেখিয়া ফেলিয়াছে· এ বিপদ হইতে মেজদিকে সে রক্ষা করিবেই— যেমন করিয়া পাবে! যদি এজন্য গৃহে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হয়, তবু সে হটিবে না! নাটক-নভেল হইতে প্রণয়ের মাহাত্ম্য সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। তার মনে অনুশোচনা জাগিল এই ভাবিয়া যে, ক্লাবে নিরালায় বসিয়া সে আলিবাবার রিহার্শাল দিতেছিল, আর তারই গৃহে এত বড় হৃদয়-নাটকের করুণ অভিনয় চলিয়াছে, সে তার কোনো খপর রাখে নাই!··

বাহিরে কার পায়ের শব্দ শুনা গেল। স্বরো তাড়াতাড়ি চিঠির টুক্‌রাটা ট্যাঁকে গুঁজিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই ঘরে আসিয়া ঢুকিল, মেজদিদি শ্রীমতী শুকতারা দেবী।

স্বরো মেজদিদির পানে চাহিল, চোখের দৃষ্টি সমবেদনায় ভরা···

আহা, বেচারী! মেজদি কিন্তু রুষ্ট স্বরে কহিল,—এত রাত্তির অবধি কোথায় ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াচ্ছিলে! লেখাপড়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই···বুড়ো হাতী!

সুরোর হাড়-পাঁজরাগুলা এ রূঢ় ভৎর্সনায় যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! হায় মেজদি, তোমার কথা ভাবিয়া সুরোর বুক ভাঙিয়া যাইবার মত হইয়াছে, আর তুমি রূঢ় ভৎর্সনায়···

মেজদি কহিল,—আমার যত মাসিকপত্রগুলো তোমার পড়ার টেবিলে এলো কি করে? ফের যদি এ-সব বই ঘাঁটো তো বাবাকে বলে তোমায় আচ্ছা করে সাজা দেওয়াবো।··লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! ও-সব বই তোমার পড়ার জন্য নয়·

অত্যন্ত অপরাধীর মত কাঠ হইয়া সুরো দাঁড়াইয়া রহিল। মেজদি ভিখনাকে কহিল,—তোর টেবিল সাফ করা হলো রে?

ভিখনা কহিল—হাঁ

সুরো এই অবসরে কহিল—আমার ট্রান্সলেশনের খাতা ছাখো দিকিন্ কি হয়েচে

মেজদি সঝঙ্কারে কহিল—খাতাপত্তর গুছিয়ে রাখতে পারো না? টেবিল নয় তো, যেন আঁস্তাকুড়! ট্রান্সলেশনের খাতা গিয়ে থাকে, ফের লেখো কথাটা বলিয়া মেজদি কাগজপত্র ঘাঁটিয়া কি খুঁজিতে লাগিল,—সুরো ভীত-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। সে ভাবিতেছিল, তার সাধু সঙ্কল্পের কথা মেজদিকে খুলিয়া বলে, কিন্তু মেজদি গোড়া হইতেই যে ঝাঁজালো ভৎর্সনা সুরু করিয়াছে! কি জানি, বামাল-সমেত গ্রেফতার হইয়া গেলে এখন হয় তো উল্টা ফল ফলিয়া যাইতে পারে! বিশেষ মেজদির হৃদয় যখন এমন বেদনার জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে!·

তার চেয়ে কার্য্যসিদ্ধির পরে বুক ফুলাইয়া যখন সে অভয়-বাণী প্রচার করিবে, তখন···ভবিষ্যতের সে ছবি মানস-চক্ষে দেখিয়া সে নিজেই বিমোহিত হইয়া উঠিল।

মেজদি কি খুঁজিতেছিল, পাইল না·· তখন ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ও শাসনের দুটা স্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া গেল—পড়ো এখন দয়া করে! কাল বাবাকে বলে দিচ্ছি—বাবুর রাত্রে ফেরা হয় আড্ডা দিয়ে। তোমার যা হাল করি, দেখো কাল···

নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর পৃথিবী! সুরোর মনে হইল, এতটুকু সহানুভূতির অভাবেও এ পৃথিবী আজো টিঁকিয়া আছে কি করিয়া?—আশ্চর্য্য!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্যোগ-পর্ব্ব

পরের দিন। খাবার-ঘরে এক ধারে বসিয়া মা আহ্নিক করিতেছিলেন। ভাত খাইতে বসিয়া মাকে একান্তে পাইয়া সুরো ফস্ করিয়া প্রশ্ন তুলিল,—হ্যাঁ মা, মেজদির বিয়ে হবে?

মা কহিলেন,—তা হবে না?

সুরো ভাতের গ্রাস মুখে তুলিল। মা জপ সারিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া মাথায় ছিটাইয়া কহিলেন,—কেন, তোমার হঠাৎ সে খোঁজ কেন?

সুরো কহিল,—না, তাই বলছিলুম। ইহার বেশী বলিবার শক্তিও যা ছিল, সেটুকু অন্তর্হিত হইল, তখনি সে-ঘরে মেজদি

আসিয়া অকস্মাৎ উপস্থিত হওয়ার দরুণ। শুকতারা কহিল,—কি বল্‌ছিলি রে ?

স্বরোর টাক্‌রায় হঠাৎ মাছের কাঁটা ফুটিল। গলায় আঙুল দিয়া কাশিয়া মুহূর্ত্তে সে এমন কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল যে, মা-ও এ-কথার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গেলেন ; স্বরোকে বকিলেন,—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! যত কাজ খাবার বেলায়! মাছের কাঁটা ছাড়া—ছাড়িয়ে খা, তা নয়, যত তাড়া এই সময়। স্কুলে যাবেন! কি নিয়ে যাবেন, তার ঠিক নেই!

শুকতারাও ধুয়া পাইয়া কহিল,—আবার নাইতে গিয়ে তোমার ছেলেব গান হচ্ছিল।

গলার কাঁটা কোথায় যে উবিয়া গেল! স্বরো কাশি থামাইয়া কান্নার স্বর তুলিয়া কহিল,—হ্যাঁ, কোথায় গান গেয়েচি ? বা রে!

শুকতারা গম্ভীব মুখে কহিল,—কেন, নাইবার ঘরে।

স্বরো কহিল,—সে বুঝি গান! আজকের জিওগ্রাফির পড়াটা মুখস্থ বলছিলুম।—বলিয়া আবার গলায় আঙুল পুরিয়া সে একটা বিকট মুখভঙ্গী করিল।

মা কহিলেন,—কাঁটা নেমে যায় নি ?

স্বরো অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দিল,—না।

মা কহিলেন,—যা তো মা শুকু, একটা কলা এনে দে তো ওকে, …কোঁৎ-কোঁৎ করে গেল্‌—এখনি যাবে'খন।

শুকতারা কলা আনিতে চলিয়া গেল। স্বরো বড় বড় ভাতের ড্যালা পাকাইয়া গিলিতে লাগিল। তার পরই সে হাঁকিল,—দুধ দাও।

মা হাঁকিলেন,—ওরে লখিয়া……

লখিয়া গরম দুধের বাটি আনিয়া পাতের কাছে ধরিয়া দিল।

শুকতারা কলা আনিয়া দিল। সুরো দুধে ভাত মাখিয়া চটপট্ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। এই মেজদির বিপদে সে ভাবিয়া সারা হইতেছে? ধেৎ, যা হয় হোক,...ভাই বলিয়া এতটুকু যার দরদ নাই, তার জন্ম সুরোর ভাবিতে বহিয়া গিয়াছে!

উপরে গিয়া দেখে, পেন্সিল নাই। হারাইয়াছে! কাল সত্ত একটা পেন্সিল কিনিয়াছে, এখন চাহিতে গেলে তাড়া খাইবে! দাদার কাছে চাহিবে? দাদার ঘরে গিয়া সে ঢুকিল। দাদা তখন নিবিষ্ট মনে স্পোর্টিং সর্টের উপর নিজের হাতে ইস্ত্রী চালাইতেছে! সুরো কহিল,—আজ তোমাদের ম্যাচ্ আদমপুর ক্লাবের সঙ্গে? না?

দাদা সোমনাথ বি-এ পড়ে। বড় বড় বই পড়ার দরুণ ছোট ভাইদের খুবই হেলার দৃষ্টিতে দেখে। বিশেষ সুবো,...ওটা তো গাধা! দাদা বলিল,—হ্যাঁ।

সুরো কহিল,—তুমি ব্যাকে খেলবে, না, হাফ ব্যাক্?

দাদা কহিল,—তোর সে খপরে দরকার! ইস্কুলে যাচ্ছিস, ইস্কুলে যা—

সুরো কহিল,—একটা পেন্সিল দাও না, দাদা। আমারটা খুঁজে পাচ্ছি না,...আজ ফার্ষ্ট আওয়ারেই অ্যালজেব্রা।...

দাদা কহিল,—আমার সে পেন্সিল তোমায় দিয়ে তার মাথা খেতে পারি না তো।

সুরো কহিল,—তা হলে চারটে পয়সা...

দাদা কহিল,—পকেট থেকে নিগে যা...

সুরো জামার পকেট হাতড়াইতে চলিল। দাদা কহিল,—দেখো, চারটে নিও, তার বেশী আর একটা নয়...

সুরো কহিল,—আর দুটো···দাদা, লক্ষীটি, দুপয়সার লজেঞ্চেস —তোমার পায়ে পড়ি···

দাদা চটিয়া কহিল,—যা, নিগে যা, ছ' পয়সা—কিন্তু আর বেশী একটিও নয়,—খবর্দ্দার!

এমন সময় মা আসিলেন; আসিয়া সোমনাথকে কহিলেন,—হ্যাঁ রে, তা হলে তিনটে একুশের ট্রেণের সময় ষ্টেশনে যাচ্ছিস্ তো ···নলিন বাবুকে আনবার জন্যে···? উনি বলে গেলেন, তোর কলেজের ছুটী আছে···তাই।

সুরো একবার মার পানে চাহিল, পরক্ষণে দাদার পানে··তাই! ···তাহা হইলে তার কথাই হইতেছে! সে তবে আসিতেছে, সত্যই? ···মেজদির তরুণ প্রাণের সেই দুরন্ত দৈত্য,···বৃদ্ধ শয়তান···?

সোমনাথ কহিল,—তোমাদের যত এ! আমার আজ বেজায় কাজ। চারটের মধ্যে গ্রাউণ্ডে যেতে হবে,···ম্যাচ। চাকর-বাকরদের কাকেও পাঠাও না, বাপু। কেন, রতন বাবু যেতে পারেন না? কি, মুন্সী?

রতনবাবু ও মুন্সী জলধিবাবুর দুই মুহুরি। মা বলিলেন,—মানী লোক, যাকে-তাকে পাঠানো চলে না, মোটরখানা বিগড়ে রয়েচে, ···তাই তোমায় বলা! এটুকুও পারবে না?

সোমনাথ বিরক্তভাবে কহিল,—আচ্ছা, আচ্ছা, হবে···যাবো, বেশ···

মা কহিলেন,—এত গোরা মেজাজ কিসের! যাঁর কাজে যাচ্ছো, তাঁর কাছে ও মেজাজ চালাতে পারো না? আমার কাছে যত তম্বি! বেশ! কাছারি বেরুবার সময় আমায় বলে গেছলেন, তোমায় মনে করিয়ে দিতে··দিলুম। তোমার কাজ তুমি করো না করো, তাঁর

সঙ্গে বোঝাপড়া করো।…মা চলিয়া গেলেন। স্বরো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; সোমনাথ ইস্ত্রী রাখিয়া সার্টটা সযত্নে ভাঁজ করিতে লাগিল।

তার পর পয়সা লইয়া স্বরো ডাকিল,—দাদা…

বিরক্তভাবে সোমনাথ কহিল,—কি? আরো পয়সা চাই না কি? … পাবে না।

স্বরো কহিল,—পয়সা নয়।

সোমনাথ কহিল,—তবে?

স্বরো কহিল,—মা ষ্টেশনে যাবার কথা বলছিল না?… কাকে আনবার জন্যে, দাদা?

সোমনাথ কহিল,—হ্যাঁ। ও নলিনবাবু—মহা খাতিরের ব্যক্তি আসচেন কি না…জ্বালাতন!

বাধা দিয়া স্বরো বলিল,—তা তোমার যদি ষ্টেশনে যাবার ফুরসৎ না থাকে, আমি গেলে হবে? আমি যেতে পারি…কথাটা বলিয়া সে দাদার পানে কৌতূহল-ভরে চাহিয়া রহিল,…সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিসন্ধি তার মনের মধ্যে তাল পাকাইয়া উঠিল।

সোমনাথ সোৎসাহে কহিল,—পারিস্ তুই যেতে?… এইটুকু বলিয়াই তার উৎসাহ কমিয়া গেল। সে কহিল,—কিন্তু তোর যে স্কুল…

স্বরো কহিল,—তা হোক্ গে, ছুটি নেবো'খন। তুমি একটা চিঠি লিখে দাও না হেড-মাষ্টারের নামে।

স্বরোর মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আঃ, তাহা হইলে…

দাদা কহিল,—আচ্ছা, লিখে দিচ্ছি! নাম নলিন বাবু · বুঝলি? বেশ মোটাসোটা লোক, আর সৌখীন। জমিদার মানুষ কি না! বয়স প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর—চিনে নিতে পারবি?

সোৎসাহে স্বরো কহিল,—খুব পারবো।

সোমনাথ বলিল,—গয়া প্যাসেঞ্জারে আসচেন, নলহাটি থেকে।... ট্রেণ এসে ভাগলপুরে পৌছুবে ৩-২১এ। তা হলে পারবি তো? যদি পারিস, তা হলে এক বোতল ক্রস্ ব্ল্যাকওয়েলের জ্যাম কিনে দেবো তোকে!

স্বরো কহিল,—কেন তুমি ভাবচো? ঠিক পারবো।

সোমনাথ স্কুলের হেড-মাষ্টারের নামে চিঠি লিখিয়া দিল; স্বরো চিঠি লইয়া মহানন্দে স্কুলে ছুটিল।

ক্লাশে ঢুকিয়া সে যতীশকে ডাকিয়া একধারে লইয়া গেল। যতীশ তাদের ক্লাবের সেক্রেটারী। সাহিত্যের পথে সে তাদের অগ্রদূত। তার কবিতা কলিকাতার মাসিক-পত্র 'কচি ও কাঁচায়' নিয়মিত ছাপা হইতেছে। মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে সে রীতিমত ওস্তাদ!

যতীশের কাছে কোনো কথা সে গোপন করিল না। মেজদিকে যে বাপ-মা একটা দুরন্ত দৈত্যের হাতে জোর করিয়া সমর্পণ করিতেছেন, মেজদির প্রাণের সহস্র নিষেধ উপেক্ষা করিয়া,—এর বিরুদ্ধে সে সকল শক্তি লইয়া দাঁড়াইতে চায়। বাড়ীতে এখনো প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে তাব সাহস হয় নাই।...বাড়ীতে সকলে এ-বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার যে, কাহারো মুখে-চোখে এতটুকু উদ্বেগের চিহ্ন-মাত্র নাই, আশ্চর্য্য......!

যতীশ কহিল,—তোর মেজদি...?

স্বরো কহিল,—মেজদির সঙ্গে কথাটা কইতেই পারি নি। তার মেজাজ কাল থেকে ভারী গরম হয়ে রয়েচে, আমায় তো বকুনি ছাড়া কথা নেই।

যতীশ কহিল,—তাই হবে! হওয়া উচিতও। বলিয়া সে

চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিল। তার পর কহিল,—বাঙালীর ঘরের অবলা বালিকা কি না,...নীরবে নির্য্যাতন সহ্য করচেন! তবু প্রাণটা ভিতর থেকে ক্ষোভে আর রোষে জ্বলে জ্বলে উঠচে, তাই সে-রোষের আগুন সব-চেয়ে যে নিরীহ, তার উপরই নিক্ষেপ করচেন...বুঝলি রে সুরো... বলিয়া যতীশ অত্যন্ত মুরুব্বির ভঙ্গীতে সুরোর পানে চাহিল। তার পর তার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল,—এইটেই যে Psychology...ঠিক!

সুরো চট্ করিয়া সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরাটা যতীশকে দেখাইল। যতীশ সেটা পড়িল। পড়া হইলে সুরো কহিল,—দেখলে?

—হুঁ। বলিয়া যতীশ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইল। সে যেন অকূল সমুদ্রে পড়িয়াছে, মুখের এমনি ভাব—ভেলা মিলিবার কোনো সম্ভাবনাও নাই!

সুরো কহিল,—সে আজ আসচে ভাই। মানে, এই দুরন্ত দৈত্যটা—আমাদের বাড়ী,—আজই...

যতীশ উদ্‌গ্রীব হইয়া সুরোর পানে চাহিয়া রহিল।

সুরো কহিল,—গয়া-প্যাসেঞ্জারে। ৩-২১ মিনিটে ভাগলপুর পৌঁছুবে। আমি তাকে ষ্টেশন থেকে আনতে যাবো।

যতীশের দুই চোখ সুগোল ও বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

সুরো কহিল,—ভেবেচি, ঐ ষ্টেশন থেকেই তাকে ধূলো-পায়ে বিদেয় করবো। তোমার সাহায্য চাই...

মনস্তত্ত্ববিৎ হইলেও যতীশ স্থির করিতে পারিল না, কি-ভাবে সে এ ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারে! আবার তার চোখ ছোট হইল এবং সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সুরোর পানে চাহিল।

সুরো কহিল,—তুমিও আমার সঙ্গে ষ্টেশনে চলো...তাকে ভুল-পথে একেবারে সেই কর্ণ-গড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলতে হবে।

যতীশ বুঝিল। বুঝিয়া কহিল,—বেশ মতলব্ বার করেচিস্ রে, তাই হবে। মোদ্দা স্থরো, তোকে এত বলি, তুই শুনিস্ না। তুই গল্প-উপন্যাস-ট্যাস লেখ্। তোর প্লট তৈরী করার বেশ মাথা আছে। আমার কথা শোন্ দিকিনি—Mind-Psychologyটা আমি সত্যই বুঝি—তাই···

স্থরো কহিল,—তা কি আমি জানি না? না হলে ঘরের কথা তোমায় বলি!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধ শয়তান

গয়া-প্যাসেঞ্জার আধ ঘণ্টার উপর লেট। ষ্টেশনের বড় ঘড়িতে চারিটা বাজিতেছে। সিগন্যাল পড়িল। স্থরো বলিল,—এইবার! মোটা-সোটা লোক—সৌখীন·· বয়স ৪০।৪৫ বছর। জমিদার মানুষ। নিশ্চয় সেকেণ্ড ক্লাশে আসচে···

যতীশ কহিল,—তুই পিছনে থাক্, মোদ্দা···

স্থরো কহিল,—ট্রেণ এলে দূরে দূরে থাকবো···কি জানি, যদি আমাদের গ্রূপ-ফটো কখনো দেখে থাকে!

যতীশ কহিল,—আচ্ছা।

একটু পরে ট্রেণ আসিয়া থামিল। স্থরো দূর হইতে উঁকি মারিতেছিল—যতীশ ট্রেণের কামরার পানে চাহিয়া রহিল। বহু

লোক নামিল। সেকেণ্ড ক্লাশ হইতে এক জন মাত্র। বাঙালী; গায়ে আলপাকার কোট, ঘড়ি, চেন!—ঠিক, এই তবে! জমিদারী চাল...মোটাসোটা...হাতে একটি ব্যাগ!...সুরো কহিল,—ওই বোধ হয়। বলিয়া সে সরিয়া গেল। যতীশ তাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

টিকিট দিয়া বাহিরে আসিয়া ভদ্রলোকটি চতুর্দ্দিকে একবার উদ্‌গ্রীব নয়নে চাহিলেন—যেন কাহাকে খুঁজিতেছেন!

যতীশ আগাইয়া আসিয়া কহিল,—আপনি নলহাটি থেকে আসচেন?

ভদ্রলোক আরাম পাইয়া হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—হঁ্যা। তুমি জলধিবাবুর বাড়ী থেকে আসচো বুঝি?

যতীশ কহিল,—হঁ্যা। আপনিই তো নলিনবাবু?

ভদ্রলোক কহিলেন,—হঁ্যা। তুমি জলধিবাবুর ছেলে?

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে না। পাড়ায় থাকি...আমাকেই পাঠিয়েচেন আপনার জন্য...

নলিনবাবু কহিলেন,—বটে!

যতীশ কহিল,—আসুন—

নলিনবাবু কহিলেন,—চলো বাবা..

নলিনবাবুকে লইয়া যতীশ পথে আসিল। ষ্টেশনে গাড়ীর অভাব নাই..ঘোড়ার গাড়ী, এক্কা প্রচুর। নলিনবাবু গাড়ীর জন্য দাঁড়াইলেন। যতীশ কহিল,—এই দিকে...

কাছেই তবে,—ভাবিয়া নলিনবাবু দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া যতীশের পিছনে চলিলেন। ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া যে-পথ সোজা গিয়াছে, সেটা সহরের বুকে গিয়া মিশিয়াছে। বাঁ দিকের পথ গিয়াছে নাথ-নগরের দিকে; ডাহিনে বাজারের পাশ দিয়া গিয়াছে ভিখনপুরের

দিকে। সোজা পথটাই জলধিবাবুর বাড়ীর দিকে গিয়াছে। যতীশ সে-পথে না গিয়া বাঁ দিকে বেঁকিল।...

পাশে ধরমশালা, নোংরা বস্তী, মসজেদ, কটা বাংলা।...ডান দিকে লালকুঠি,—মিশনারীদের আস্তানা। সে সব ছাড়াইয়া যতীশ নলিন বাবুকে লইয়া সোজা চলিল।

বাঁ-দিকে একটা গলি। যতীশ কহিল,—এ পথে শাজঙ্গী।

নলিনবাবু কহিলেন,—শাজঙ্গীটা কি বস্তু?

যতীশ কহিল—একটা প্রকাণ্ড তালাও আছে—তার পাশে উঁচু পাহাড়ের মত টিলা। সেই টিলার উপর পীরের আস্তানা। বেশ জায়গা...যাবেন?

নলিনবাবু হাসিয়া কহিলেন,—এখন থাক্, আগে কাজ সারা যাক্—তার পর সময় পেলে দেখা যাবে...

যতীশ ভাবিল, কাজ সারার মানে, বিবাহ! সেই ছেঁড়া চিঠির কথা তার মনে পড়িল। বৃদ্ধ শয়তান—টাকার জোরে এক বালিকার পাণিপীড়ন করিবে, ভাবিয়াছ? বিবাহ করিতে আসিয়াছ। বুড়া বয়সেও বিবাহের সাধ মিটে নাই? চলো, ভালো করিয়াই তোমার বিবাহ দেওয়াইতেছি!

পথে কি ধূলা! বাপ! নলিন বাবুর এ ধূলায় দম বন্ধ হইবার জো! সৌখীন মানুষ তিনি সত্যই...পায়ে হাঁটার অভ্যাস কম...তায় গরমও মন্দ নয়! গায়ে আলপাকার কোট...বেশ কষ্ট হইতেছে! এতখানি পথ হাঁটিয়া সারা দেহ ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে! তিনি রুমালে ঘাম মুছিয়া কহিলেন,—আর কত পথ বাকী?

যতীশ কহিল,—আজ্ঞে, এই এলুম বলে...

নলিনবাবু কহিলেন,—একখানা গাড়ী নিলে হতো...

যতীশ কৃত্রিম দুঃখের ভঙ্গীতে কহিল,—ইস্, ভারী ভুল হয়ে গেছে! আমাদের পায়ে হাঁটাই অভ্যাস কিনা·· গাড়ীর কথা মনে ছিল না!

নলিনবাবু হাসিলেন,—নিরুপায়ের হাসি! হাসিয়া কহিলেন,—মন্দ কি, exercise হচ্ছে—খিদে হবে'খন!···জলধিবাবুর আয়োজনও তো সামান্য হবে না·এত বলি ওঁকে, বয়স হলো তো—তা শোনেন না।

যতীশ মনে মনে কহিল, সে আয়োজন কোথায় হইতেছে, এটা ভাবিবার কথা বটে!

নলিনবাবু তখন গল্প সুরু করিয়া দিলেন;—ভাগলপুরে বাঙালী কত আছে? হিন্দুস্থানীই বা কত? এখানকার বাফ্‌তা কাপড়ের বাজারটা কোন্ দিকে? তাঁত আছে, না, কল? বাঙালীরা চাকরির মায়া ছাড়িয়া বাফ্‌তা তৈরী করে না কেন? খদ্দরের হুজুগ কেমন? ক'টা স্কুল? কলেজ গভর্ণমেণ্টের নয়? কর্ণ গড়টা কি? কোন্ কর্ণের গড়? এমনি নানা কথা···যতীশও হঠিবার পাত্র নয়···সব কথার সে লাগসৈ জবাব দিয়া চলিয়াছে।

কথায় কথায় পথের কষ্ট-সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলেও পা এ-দিকে বেশ ভারী হইয়া উঠিয়াছে·· আর নাকে-চোখে ধূলা ঢুকিতেছে, ওঃ!—পথে পা দিয়া চলিয়াছি, না, তুলার উপর দিয়া! নলিনবাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলেন,—আর কত পথ, বাবা?

যতীশ থামিল এবং অত্যন্ত বিনয়-বিজড়িত স্বরে কহিল,—আপনার কষ্ট হচ্ছে?

নলিনবাবু কহিলেন,—না, কষ্ট ঠিক নয়···তবে হাঁটার তেমন অভ্যাস নেই কি না···তা, একখানা গাড়ী পাওয়া যায় না?

যতীশ কহিল,—না, এ-ধারে গাড়ী পাওয়া যায় না তো···

নলিন বাবু কহিলেন,—অর্থাৎ বুঝলে কি না, আমার এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হলো, তা পঁয়তাল্লিশ বছরে এত পথ একটানে কখনো হাঁটিনি! তা ছাড়া আসলে এই ধূলো,…এমন ধূলো কখনো দেখিনি…উঃ!

যতীশ কহিল,—আমার মামা এই ভাগলপুরের ধূলো সম্বন্ধে এক মজার গল্প বলেছিলেন··

নলিন বাবু কহিলেন,—বটে! কি গল্প?

যতীশ কহিল,—তিনি বলেছিলেন, একবার তিনি ভাগলপুরে এসেছিলেন, তার পর কলকাতায় ফিরে তাঁর কাপড়ের ট্রাঙ্ক খুলে দেখেন, সব কাপড় ধূলোয় এমন ময়লা হয়েচে যে, সব কাপড় ধোপার বাড়ী কাচান, কাচিয়ে তবে ব্যবহার করতে পারেন··

নলিন বাবু আবার হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—সে নেহাৎ গল্প নয়·· সত্যিই হবে!

আরো খানিক পথ। পাশে একটা ভাঙা মন্দির। নলিন বাবু কহিলেন,—আর পারচি না বাবা, বসে একটু দম নি…তুমি বাবা, এত কষ্টই করলে যখন, তখন আর একটু কষ্ট করে একখানি গাড়ী বরং ছাখো…

যতীশ কহিল,—কিন্তু আর এই একটুখানি পথ…

নলিন বাবু কহিলেন,—না বাবা, আর পারচি না…বলিয়া তিনি মন্দিরের ভাঙা একখানা পাথরের উপর বসিয়া পড়িলে; —বসিয়া গায়ের আলপাকার কোট খুলিয়া কোলের উপর রাখিলেন।

যতীশ কহিল,—তা হলে একখানা গাড়ীই দেখি…?

যতীশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।. নলিন বাবু কহিলেন,—গাড়ী

না পাও যদি, তো একা হলেও চলবে···বলিয়া তিনি প্রচণ্ড রকমের একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

—বেশ, দেখি···বলিয়া যতীশ ডান-দিকের একটা বাগানের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তরঙ্গ-ভঙ্গ

দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার পর নলিন বাবুর ক্লান্তি কমিল। কিন্তু তিনি দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন—গাড়ী···গাড়ী কৈ? ছোকরা গাড়ী আনিতে সেই যে গিয়াছে, ফিরিবার নামটি নাই!···চিন্তা ক্রমে বিরক্তিতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং বিরক্তি রাগে পরিণত হইবার জো,—এমন সময় সহসা এক বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

নলিন বাবু তাঁকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন,—জলধিবাবুর বাড়ী কত দূর, মশায়?

লোকটি আশ্চর্য্য হইয়া নলিন বাবুর দিকে চাহিল; কহিল,—উকিল জলধি বাবু?

নলিন বাবু তার বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া ভড়কাইয়া গিয়াছিলেন। এখন তাঁর মুখে এ প্রশ্ন শুনিয়া তিনি একটু আরাম পাইলেন; কহিলেন,—হ্যাঁ। উকিল জলধি বাবুই।

লোকটি কহিল,—তা, তাঁর বাড়ী তো ভাগলপুরে···

নলিন বাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! তিনি কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? না! এ তবে কোন্ দেশ? তিনি বিস্ময়-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এটা কি ভাগলপুর নয়?

লোকটি কহিল,—না, এ হলো নাথনগর। ভাগলপুর এখান থেকে তিন মাইল হবে···আর জলধি বাবুর বাড়ী···পুরো পাঁচ মাইল।

সর্ব্বনাশ! উল্টা পথে এই তিন মাইল তিনি হাঁটিয়া আসিয়াছেন!

লোকটি কহিল,—আপনি কোত্থেকে আসচেন?

নলিন বাবুর প্রাণটা অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া উঠিল। করুণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন,—নলহাটি।

লোকটি কহিল,—এই ট্রেণে?

নলিন বাবু কহিলেন,—হ্যাঁ।

লোকটি কহিল,—তা, নাথনগরে নামলেন কেন? ভাগলপুর ষ্টেশন ছেড়ে?

নলিন বাবু কহিলেন,—ভাগলপুরেই নেমেছিলাম।

লোকটি কহিল,—তা হলে সম্পূর্ণ উল্টো পথে এমন করে এলেন যে?

বয়স অল্প হইলে নলিন বাবু বুঝি কাঁদিয়া ফেলিতেন! এ বয়সে চোখের জল না কি মানায় না, তাই কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া তিনি কহিলেন,—সে কথা আর শুনে কি করবেন! এক হতভাগা ছোকরা··· কিন্তু যাক্ সে কথা···মোদ্দা, ভাগলপুরে যাবার জন্য গাড়ী একখানা পাওয়া যাবে কি?

লোকটি কহিল,—মুস্কিল!

নলিন বাবু কহিলেন,—একা?

একমাত্র পুত্রের কঠিন রোগে চিন্তাকুল বিধবা মা ডাক্তারের উত্তরের প্রতীক্ষায় যেমন কাতর-বিহ্বলভাবে ডাক্তারের পানে চাহিয়া থাকেন, এ প্রশ্ন করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় তেমনি কাতর-চিন্তাবিহ্বল ভাবে নলিন বাবু লোকটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

লোকটি জবাব দিল,—এক্কা মিলতে পারে। তবে···মানে, ভাগলপুরের এক্কা, কাশীর এক্কার মত নয়···

নলিন বাবু কহিলেন,—না হোক—এ পা-ছুটোকে তার উপর গুড়িয়ে ফেলতে পারলে এ যাত্রা বুঝি বেঁচে যাই। বলিয়া তিনি উঠিয়া ভদ্রলোকটির দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন,—একখানা এক্কা দয়া করে যদি দেখে দেন, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো···

এ কথায় লোকটির দয়া হইল। সে কহিল,—আচ্ছা, বসুন, আমি দেখচি···

নলিন বাবু ভাবিলেন, এ-ও যদি সরিয়া পড়ে? তিনি কহিলেন, —কতদূরে এক্কা মিলতে পারে?

লোকটি যেদিক হইতে আসিতেছিল, সেই দিকে দেখাইয়া কহিল, —কাছেই নাথনগর ষ্টেশন। সেখানে মিলবে নিশ্চয়।

নলিন বাবু কহিলেন,—চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই···

কবে সেই ছেলেবেলায় বইয়ে-পড়া কথাটা তাঁর মনে পড়িল— 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' তাঁর মনে হইল, এ লোকটিকে তিনিও বলেন, বাঙালীকে বাঙালী না রাখিলে কে রাখিবে, ভাই? বিশেষ, এই খোট্টার দেশে?

ভাগ্য ফিরিয়াছিল। গ্রহ কাটিয়াছে···কাজেই এবার একটু অগ্রসর হইতেই এক্কা মিলিল, চলন্ত এক্কা। নাথনগরের দিক হইতে

আসিতেছিল। ভাগলপুরের শ্বশুরপুরে জলধি বাবুর বাড়ী। এক্কাওয়ালা দু'টাকা ভাড়া চাহিল। লোকটি কহিল,—ধেৎ! আট আনা।

নলিন বাবু কহিলেন,—দু'টাকাই দেবো। উঠে বসতে দে, বাবা…

নলিন বাবু এক্কায় উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া লোকটিকে কহিলেন,—আপনিও তো ভাগলপুর যাবেন? আসুন…

লোকটি কহিল,—আমি হেঁটেই যাবো…

নলিন বাবু কহিলেন,—বিলক্ষণ! তা-ও কখনো হয়! আপনি আজ আমায় কি বাঁচন বাঁচিয়েছেন…আর একটু এ-ভাবে থাকতে হলে আমি বোধ হয় ভেবেই মরে যেতুম।

এক্কা বিপুল বিক্রমে ভাগলপুরের দিকে ছুটিল।

সুজাগঞ্জের পর পথে হঠাৎ এক্কার চাকার হাল খসিয়া গেল। গাড়োয়ান জানাইল, নামিতে হইবে, নামা ছাড়া উপায় নাই।

লোকটি কহিল,—আমি অন্য পথে যাবো। আর কতটুকুনই বা! পাঁচ-সাতখানা বাড়ীর পরই মস্ত বাড়ী দেখবেন ডান-দিকে, সামনে পাঁচিল-ঘেরা বাগান, বড় ফটক…সেইটে জলধি বাবুর বাড়ী।

নলিন বাবু তাঁকে ধন্যবাদ দিয়া এক্কাওয়ালার ভাড়া চুকাইলেন, তার পর ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া আবার পথের পথিক হইলেন।

এ লোকটি ভালো, সত্য কথা কয়। একটু আগে ডানদিকে সত্যই মস্ত বাড়ী।

ফটকের সামনে দু'টি ছেলে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিল। নলিন বাবু তাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—এইটে জলধি বাবুর বাড়ী?

কথা শুনিয়া এক জন ছোক্‌রা চমকিয়া উঠিল! সে সুরো। মুখ দেখিয়া সে চিনিল, ইনি ষ্টেশনে-দেখা সেই নলিন বাবু!

রাস্কেল যতীশ! বিশ্বাসঘাতক! বেইমান! তাকে সন্থ দাদার

ফাউণ্টেন পেনটা চুরি করিয়া দান করিয়া আসিয়াছে, সে না বলিল, নলিন বাবুকে ভাগলপুর-ছাড়া করিয়া দিয়াছে! আর এই···নাঃ, পলাইধারও উপায় নাই!

তাড়াতাড়ি বন্ধুকে বিদায় দিয়া স্বরো কহিল,—আপনি জলধি বাবুর বাড়ী যাবেন?

নলিন বাবু কহিলেন,—হঁ্যা।

দিনের আলো তখন নিব-নিব। স্বরো অত্যন্ত কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—তা—জলধি বাবুর বাড়ী যে মস্ত বিপদ!···

বিপদ! নলিন বাবু শিহরিয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি বিপদ?

স্বরো তেমনি কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—মানে, তাঁর একটি মেয়ে—অর্থাৎ তাঁর মেজ মেয়ে শ্রীমতী শুকতারা দেবী, যার বিয়ের কথা এক রকম পাকা হয়েছিল, সে আজ মারা গেছে।

নলিন বাবু মুহূর্ত্ত থ হইয়া রহিলেন, তার পর কহিলেন,—তাই তো, কিন্তু কাল আমি জলধি বাবুর চিঠি পেয়েচি, তাতে কারো অসুখের কথা কৈ লেখেন নি তো তিনি!···তাঁর দুই চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিল।

স্বরো কহিল,—আজ্ঞে, অসুখ-বিসুখ এমন কিছু নয়, কি-একটা মনে আঘাত পেয়ে নাকি—মানে, sudden shock···তাতেই হার্ট-ফেল হয়ে হঠাৎ মারা গেছে।

আহা! নলিন বাবু কাতরভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। স্বরো তাঁর পানে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বুকে ঘা লাগিয়াছে? বটে! বর্ব্বর বৃদ্ধ! তোমার সঙ্গে বিবাহ হইবে, এই চিন্তায় হার্ট-ফেল হইয়া মারা গিয়াছে, বেচারী বালিকা,···ইহা ভাবিয়া বুড়ার অনুতাপ কতখানি ফোটে, স্বরো তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল।

নলিন বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—তা হলে এ সময় তাঁকে বিব্রত করা—তাই তো,...অথচ এত বড় বিপদে তাঁর সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়াও ঠিক হবে না।...নলিন বাবু কি ভাবিতে লাগিলেন।

সুরো কহিল,—তিনি বড্ড কাতর হয়ে পড়েচেন,—মানে, এই মেয়েটিই ছিল তাঁর প্রাণ—অর্থাৎ—

নলিন বাবু আর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। তার পর আত্মগত-ভাবেই কহিলেন,—এখন নয় থাক্।—বলিয়া তিনি যে-পথে আসিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পথে ফিরিলেন।

সুবোর মনে হইল, সে একবার খুব উচ্চ হাস্য করিয়া প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়া আকাশটাকে টানিয়া নীচে নামাইয়া আনে!...কিন্তু, না, ও-শয়তান এখনো দৃষ্টির অন্তরালে যায় নাই। সে ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। তার মনে যে আনন্দ হইতেছিল,—সেকন্দর শাহ যুদ্ধ জয় করিয়াও বুঝি কোনো দিন এমন আনন্দ পান নাই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেকন্দরের পরাজয়

অন্দরে আসিতেই দাদা কহিল,—এই যে শূয়ার...! সুরো

সুরো কাছে আসিল। সোমনাথ কহিল,—ষ্টেশনে গেছলি?

সুরোর বুক কাঁপিল। সে কহিল,—গেছলুম।

সোমনাথ কহিল,—নলিন বাবু কোথায় গেলেন তবে ?

সুরো কহিল,—তা আমি কি জানি !

সোমনাথ কহিল,—তিনি আসেন নি ?

সোমনাথ ডাকিল,—মা—

মা পাশের ঘরে ছিলেন, আসিলেন। সোমনাথ কহিল,—এই শোনো সুরোর কাছে। ও যাবে বললে…তাই…

মা বলিলেন,—যাও, তুই ভাইয়ে বোঝাও গে—উনি রাগ করছিলেন, ওঁর মান গেল…ইজ্জৎ গেল! এটুকু কাজও ছেলেরা করতে পারে না ? আমায় কত বক্‌ছিলেন !

সোমনাথ কহিল,—তোমার এই রত্নটিকে জিজ্ঞাসা করো না,—ষ্টেশনে গেছলো কি না,…ও ভার নিয়েছিল বলেই না—

মা বলিলেন,—আমি জানি না বাছা,—দু-ভাইয়ে ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে বোঝাও গে—

সোমনাথ সুরোর কান ধরিল, ধরিয়া কহিল,—চ রাস্কেল বাবার কাছে—দেখচি আমি !

সুরো যেন চোর ! বাপের কাছে গিয়া দাঁড়াইতে হইল। দাদা ছাড়ে না ! বাবা মোকদ্দমার কাগজ-পত্র রাখিয়া গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া আছেন। সোমনাথ কহিল,—সুরো ষ্টেশনে গেছলো, বলচে—

বাবা সুরোর পানে চাহিলেন। সুরো কহিল,—গেছলুম, বাবা।

বাবা কহিলেন,—নলিন বাবু আসেন নি ?

সুরো কি উত্তর দিবে ? বাবা রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন, —তোর মিছে কথা। তুই কখ্‌খনো যাস্‌নে—

সুরো কহিল,—গেছলুম।

বাবা ধমক দিয়া কহিলেন,—তবে কি ভদ্রলোকটি উবে গেলেন, বল্‌তে চাস্ হতভাগা বাঁদর ?

তার জবাব দিবার পূর্ব্বেই নলিন বাবু আসিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর মুখে-চোখে কাতরতার ভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। একে অত পথ ধূলায় হাঁটিয়া শ্রান্তি, তায় এত বড় দুঃসংবাদ! তার ছায়ায় তিনি যেন কি হইয়া গিয়াছেন। তাঁর পানে চাহিয়া, তাঁর মূর্ত্তি দেখিয়া জলধিনাথ চমকিয়া উঠিলেন।

সুরো···? ভয়ে সে নিস্পন্দ!

ঘরে ঢুকিয়াই নলিন বাবু বিচলিত কণ্ঠে কহিলেন,—আপনার এ বিপদের কথা শুনে বড্ডই আমি কাতর হয়েচি, জলধি বাবু!

অভ্যর্থনার সুযোগ মিলিল না। তাঁর কথা শুনিয়া জলধি বাবু অবাক হইয়া কহিলেন,—বিপদ? আমার বিপদ? কেন, কি হয়েচে? কোথায় শুনলেন?

জলধি বাবুকে এ অবস্থায় দেখিবেন, নলিন বাবু তা কল্পনা করেন নাই। তিনি কেমন যেন ভড়কাইয়া গেলেন! কোথায় কি একটা যেন মস্ত গোল বাধিয়াছে! হঠাৎ তাঁর নজর পড়িল সুরোর উপর;— সে তখন সন্তর্পণে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল।

নলিন বাবু কহিলেন,—এই যে ··এই ছেলেটিই বলছিল, আপনার মেজ মেয়েটি হঠাৎ মারা গেছে নাকি আজ···

—মেজ মেয়ে মারা গেছে!···আমার··? সরোষ দৃষ্টিতে জলধি বাবু সুরোর পানে চাহিলেন। সুরো ততক্ষণে সরিয়া বাঁচিয়াছে!

জলধি বাবু নলিন বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন, বিপদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—নলিন বাবুকে না দেখিয়া তিনি দুশ্চিন্তায় কতখানি যে কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন,·· হতভাগা ছেলে···

নলিন বাবু কহিলেন,—যাক্, যাক্… খপর ভালো তো ? আঃ, বাঁচলুম !… আমার এমন ভাবনা হয়েছিল ! তা ছাড়া যে গ্রহের ভোগ আজ্ গেছে—যাক্, আপনার খপর ভালো জেনে ভারী আরাম পেলুম !

জলধি বাবু হাঁকিলেন,—ভিখ্না—

ভিখ্না আসিল। তিনি কহিলেন,—বাবুকে বাথ-রুমে নিয়ে যা। তার পর নলিন বাবুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—আপনি মুখ-হাত ধুয়ে নিন—তার পর জিবোন—জল-টল খান ! আপনাকে দেখে বাঁচলুম। কি অস্বস্তি যে ভোগ করছিলুম…সোমনাথকে তিনি কহিলেন,—যাও সোমনাথ, এঁদের বলো গে, নলিন বাবু এসেচেন। এঁরা সবাই বড় ভাবিত হয়ে রয়েচেন, কোনো অসুখ-বিসুখ হলো, না, কি—

* * *

মেজ-দি নিজের ঘরে বিছানায় শুইয়া এ মাসের 'তরুণ আলো' পড়িতেছিল। সুরো আসিয়া চোরের মত খাটের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে ডাকিল,—মেজ-দি…

মেজ-দি বই রাখিয়া কহিল,—কি রে ?

স্বরে বেদনা মিশাইয়া সুরো কহিল,—সে এসেচে, ভাই—

—কে রে ? মেজ-দির বিস্ময়ের সীমা নাই !

সুরো কহিল,—এত করেও আট্‌কাতে পারলুম না—ভাই মেজদি।

—কাকে ?

মেজ-দির বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। মেজ-দি উঠিয়া বসিল।

সুরো কহিল,—সেই যে তুমি লিখেছিলে, তরুণ প্রাণের দুরন্ত দৈত্য…

শুকতারা অবাক্! তরুণ প্রাণ…দুরন্ত দৈত্য…সুরো এ-সব বলে কি? পাগল হইয়া গেল না কি?

শুকতারা কহিল,—কি পাগলের মত বক্‌চিস্! এঁ্যা?

সুরো সেই চিঠির টুকরা বাহির করিয়া কহিল,—তোমার সঙ্গে বাবা-মা জোর করে যার বিয়ে দিচ্ছে… এই যে তুমি কাকে চিঠিতে লিখেচো,—দুরন্ত দৈত্য, বৃদ্ধ শয়তান…

শুকতারা গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল,—ওরে হতভাগা ছুঁচো, বটে! বড্ড পেঁপিয়ে উঠেচো, দেখচি! হুস্তি-দীঘি জ্ঞান নেই,…বড় বোনের সঙ্গে ঠ্যাকরা! বাবাকে বলে তোমায় জুতো খাওয়াচ্ছি—দ্যাখো মজা, ··দে এ লেখা। একটা গল্প লিখেচি, 'তরুণ আলোয়' পাঠাবো বলে·· একখানা পাতা খুঁজে পাচ্ছিলুম না,…তুমি নিয়ে বসে আছো, …ফাজিল, বাঁদর, ভূত…

এ কথার পর আর তিলমাত্র দাঁড়ানো চলে না! বিশেষণগুলা একবারেই গর্হিত! সুরো কাগজ ফেলিয়া দে-ছুট!

ব্যাপারখানা পরিষ্কার হইল আরো আধ ঘণ্টা পরে, ভিখ্‌না আসিয়া যখন কহিল,—আজ ছোট দাদাবাবু, তুমি মার ঘরে শুবে—এ ঘরে ঐ বাবুটি শুবেন।

সুরো কহিল,—কে? ঐ যে বাবু এসেচে?

ভিখ্‌না বলিল,—হাঁ।

সুরোর হাড় জ্বলিয়া উঠিল। সে কহিল,—ও বাবুটি কে রে যে এত আদর?

ভিখ্‌না বলিল—ও এক ভারী জমিদার, বাবুর খুব বড়া মোয়াক্কেল

আছে—ভারী মোকদ্দমা লড়তে এসেচে। বহুৎ বহুৎ ফীজ্ দেবে—কথাটা বলিয়া সে দাঁত মেলিয়া হাসিল।

জবাব শুনিয়া সুরোর মনে হইল, পৃথিবীখানা দু' ফাঁক হয় না কেন? তাহা হইলে তার মধ্যে ঢুকিয়া এ বিপদে সে আশ্রয় লয়! কাল সকালে তাকে লইয়া বাড়ীতে যে কি কাণ্ড ঘটিবে, তা কল্পনা করিয়া ভয়ে-ভাবনায় সে মেজের উপব লুটাইয়া শুইয়া পড়িল।

স্বামী-স্ত্রী

তেজগাঁওয়ে বদলি হইবার সময় তরুণী পত্নী সুরমাকে ফণী সঙ্গে লইয়া চলিল। জঙ্গুলে দেশ। জঙ্গলের মধ্যে ছোট বাঙ্‌লো। আসিবার দুদিন পরে সুরমাকে ফণী কহিল,—তোমার ভারী কষ্ট হবে,—একলাটি, এই বনের মধ্যে· ·নয়?

সুরমা হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সীতাদেবী যে এর চেয়েও ঢের ভারী জঙ্গলে ছিলেন, মশায়! সে জঙ্গলে বাঙ্‌লোও' ছিল না,···তাতে তাঁর কষ্ট হয়েছিল কি! অথচ তিনি রাজাব মেয়ে, রাজার বৌ···

ফণী কহিল,—তাঁব সঙ্গে বামচন্দ্র ছিলেন যে···

সুবমা স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া সোহাগে গলিয়া গিয়া জবাব দিল,—আমাব রামচন্দ্রও তো সঙ্গে আছেন,—তবে—? আমারি বা কষ্ট হবে কেন?

ফণী সাদরে পত্নীর অধরে চুম্বন করিয়া কহিল,—কিন্তু তোমার বামচন্দ্র যে এখানে চুপ করে থাক্‌তে পাচ্ছেন না! জরিপের কাজে সরকারী হুকুমে সারা জেলার বন-বাদাড় ঢুঁড়ে তাঁকে সব মেপে-জুপে বেড়াতে হবে ··কালই একবার বেরুতে হচ্ছে হাত-নাগাদ!

আসন্ন বিরহের করুণ ছবি চোখের সামনে জাগিয়া উঠিল; অমনি সুরমার দুই চোখ বাষ্পার্দ্র হইয়া আসিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আকাশের পানে চাহিল।

ফণী কহিল,—তোমার হার্ম্মোনিয়ম রইলো, স্বরলিপির বই রইলো আমার' কথা ভেবে তুমি বিরহের গান গেয়ে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলি

কাটিয়ে দিতে পারবে না, সুরো ? ভয় কিছু নেই। মথুরা থাকবে, পুরোনো চাকর। তাছাড়া ঠাকুর, দাই-ঝী লছমনিয়া—আর আমার রিভলভার···বলিয়া সে থামিল ; একটু পরে হাসিয়া কহিল—আরো ভরসার কথা এই যে, এ বন পঞ্চবটী নয়, স্বর্ণমৃগ আর রাবণের ভয়ও কাজেই—

সুরমা স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—থামো। কি রসিকতাই যে শিখেচো,—মরি !

ফণী এ-কালের ছেলে। গৃহে পর্দ্দা-প্রথা চলিলেও সে তাকে আমোল দিতে নারাজ। সুরমা ম্যাট্রিক অবধি পড়িয়াছে। বাঙালী-ঘরের ঘোমটা-দেওয়া বৌ সাজিতেও যেমন সে কাতর নয়, তেমনি পায়ে জুতা আঁটিয়া অকুতোভয়ে বাহিরে বেড়াইতেও তৎপর। জড়োসড়ো ভাব তার কোথাও নাই। তার তরুণ বয়স, আর বিকশিত রূপশ্রীতে এমন একটি অবাধ স্বচ্ছন্দ-লীলা যে পথিক তাকে পথে দেখিলে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে,—গৃহে সে-মূর্ত্তি অপরূপ ছবি গড়িয়া তোলে !···

বৈকালের দিকে ফণী মহা উৎসাহে এক অতিথি আনিয়া হাজির করিল ; সুরমাকে ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিল,—আমার সহপাঠী বন্ধু, বঙ্কু···এখানকার পাথরের কোয়ারিতে এঞ্জিনিয়ার। থাকে প্রায় চার মাইল দূরে এমনি এক নির্জ্জন বাঙ্‌লোয়—হঠাৎ পথে দেখা। এঞ্জিনিয়ার হলে কি হয়, সুরের ব্যাপারে এমন ওস্তাদ যে, সুরলোককে এনে মর্ত্ত্য-লোকে বসিয়ে দিতে পারে ! আমাদের কত পার্টিতে···

বঙ্কু সবিনয়ে সুরমাকে অভিবাদন করিল। সুরমা কহিল,—আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আস্‌বেন,···

ফণী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিয়া কহিল,—তাহলে ওঁর আপাততঃ আসা চলে না…

স্বামীর উচ্চ হাস্য-ধ্বনিতে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুরমা তার মুখের পানে চাহিল।

ফণী কহিল,—ইনি এখনো বিবাহ করবার অবসর পান্‌নি; সুরো, কাজেই স্ত্রী কোথায় পাবেন যে…

সুরমার কপোলের রক্তিম আভা তখনো মিলাইয়া যায় নাই। ফণী কহিল,—যাক, ভালোই হলো…আমার অনুপস্থিতিতে তোমার এই লক্ষ্মণ দ্যাওরটি তোমার তদ্বির করবেন, পঞ্চবটী বনে…আমিও নিশ্চিন্ত হলুম। স্বর্ণমৃগকে সাবধান, মোদ্দা!…যাক্, এখন চায়ে অতিথির অভ্যর্থনা সুরু হোক্…

চা আসিল, তারপর নানা গল্প। বন্ধু বেশ গুছাইয়া গল্প বলিতে পারে। তার এই ত্রিশ বৎসর বয়সে সে বহু দেশ ঘুরিয়াছে, বহু অজানাকে বন্ধু করিয়াছে, বহু পরকে আপন করিয়াছে। কোথায় ওদিকে সেই সুদূর মান্দ্রাজ, বোম্বাই, এদিকে কাশ্মীর—চাকরি সে বহু স্থানে করিয়াছে। অনেকের সঙ্গে মিশিয়াছে, অনেক দেখিয়াছে, ভালো চাকরি ছাড়িয়া দিতে মনে তার নিমেষের দ্বিধা জাগে নাই। এখন এই তেজগাঁওয়ের পাথরের খনিতে আসিয়া জুটিয়াছে। যেখানে গিয়াছে, একদম্ 'বড়া সাহেব'—কাহারও তাঁবে ছোট চাকরির সে কেয়ার করে না!

সুরমা অবাক্ হইয়া বন্ধুর গল্প শুনিতেছিল। এ লোকটির অন্তরের মধ্যে একটা দুর্ম্মদ অস্থির ঝড় বহিতেছে, যেন সারাক্ষণ! গল্প শুনিতে শুনিতে তার কেবলি মনে পড়িতেছিল, রবি-কবির সেই কয় ছত্র…

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন —
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন...

এ একেবারে বাঙালীর বাঁধা-ধরা রুটীনের বহির্ভূত খানিকটা মরু হাওয়া···কেমন একটা বিশেষত্ব আছে, নূতনত্ব আছে এর কাজে !

ফণী কহিল,—একটা গান শুনিয়ে দাও তো হে তোমার বৌদিকে ···ইনিও স্বর-সাধনা করে থাকেন। তবে মুস্কিল হয়েচে এই যে, আপাততঃ এ-বনে উৎসাহের লেশমাত্র পাবেন না···আমি তো চাকরির দড়ি ধরে ছুটোছুটি করে বেড়াবো···

বঙ্কু উঠিল এবং নিমেষ-পরেই সুরের ধারা বর্ষণ করিয়া সুরমার মুগ্ধ চিত্তকে আরো মুগ্ধ, বিহ্বল করিয়া তুলিল।

গাহিবার পর বঙ্কু বলিল,—এবারে বৌদির একখানি গান······

এ কথায় সুরমার কর্ণমূলে আরক্ত আভা ফুটিল, দুই চোখে লজ্জার আবেশ নিবিড় হইয়া নামিল ! মুখ আর তুলিয়া রাখা যায় না ! কে যেন জোর করিয়া তার মাথাটাকে নোয়াইয়া ধরিয়াছে ! অধরের কোণে লজ্জার মৃদু হাসি······

তবু গাহিতে হইল। গুণের এই যে আপনাকে প্রকাশের বাসনা ···খ্যাতি আদায় করিবার এই যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মানুষের মনকে এ যে কোন্ আদিম যুগ হইতে সর্ব্বক্ষণ এ-দিকটায় উন্মত রাখিয়া আসিতেছে······

সুরমাকে গাহিতে হইল। বঙ্কু নির্ব্বাক্ মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল।······

গান থামিলে বঙ্কু কহিল,—বাঃ, খাসা ! এমন গান আমি

কখনো শুনিনি···স্বরে এমন তন্ময়তা, প্রকাশের এমন সহজ ভঙ্গী··· গান ঢের গাইতে শুনেচি ফণী, ··ও, রাজপুতানার বিখ্যাত হীরাবাঈয়ের গানও শুনেচি—কিন্তু এ! বৌদির কণ্ঠে সাতটা স্বর এমন অবলীলায় লীলায়িত হয়ে উঠচে···এর তুলনা চলে, বুঝি, শুধু পাখীর গানের সঙ্গে ···আমার নমস্কার নিন্ বৌদি······

জয়ের উল্লাসে সুরমার চিত্ত তখন ভরপুর! সলজ্জ হাসি-ভরা অধর-পুট···চোখে লজ্জার ললিত-কোমল শ্রী! সে বন্ধুর পানে চাহিল। বন্ধু তারি পানে চাহিয়া ছিল,—চোখে চোখ মিলিবামাত্র সুরমা চোখ নামাইল।······

২

ছোট্ট বাঙলা। সুরমা একা···তরুণ মন স্বামীর সঙ্গ পাইবার জন্য একান্ত অধীর, আকুল। কোথায় স্বামী? সময় তার আর কাটিতে চায় না! একটা টেবল্‌হার্মোনিয়ম, দু'খানা পুরানো স্বরলিপির বই, খান-পঁচিশ বাঙলা নভেল,—তা'ও কতকালের পুরানো, মলাট খসিয়া গিয়াছে, পাতাগুলায় কালির দাগ। আর এই দাসী-চাকরের দল। এ-বয়সে মন কি এ-সবের মধ্যে বসিতে চায়!

গান? কিন্তু কার জন্য সে গাহিবে? এমনি?—তা সে গায়; কিন্তু দুটার পর তিনটা গান গাহিতে আর রুচি হয় না! হার্মোনিয়ম বন্ধ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। বাঙলোর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ায়·· সাম্‌নে একটা বড় ঝাউগাছ, তার ওদিকে ক'টা ঐ খেজুরগাছ, একটা শিশুগাছ, ছোট ছোট কতকগুলা চারা···একটা পাখী ঐ উড়িতেছে···পথ বাঁকিয়া গিয়াছে—সে-পথে মাঝে মাঝে লোক-জন চলে···ও-পথ কোথায় গিয়া যে শেষ হইয়াছে! ঐ পথেই ফণী গিয়াছে, তার চাকরির কাজে!

…ও-পথের পরে সব তার অজানা! দীর্ঘশ্বাসে সুরমার মন ভরিয়া ভারী হইয়া ওঠে!

নিত্য এমন হয়। এমনি-ভাবে পথের পানে সে তাকাইয়া থাকে—শূন্য উদাস মনে। ওদিকে কোথা দিয়া দিনের আলো যে কখন নিবিয়া আসে, অন্ধকার নামিয়া পড়ে…! সহসা চেতনা পাইয়া সুরমা আসিয়া ঘরে বসিয়া ঐ পুরানো বহিগুলারই একখানা টানিয়া পাতা উল্টায়। মন সে-বহির পাতায় এক তিল তিষ্ঠাইতে পারে না! সে শুধু বাহিরে ছুটিতে চায়·· কোথায়? কোথায়…?

সেদিনও সে তেমনি দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বঙ্ক আসিয়া হাজির। বঙ্ক ডাকিল—বৌদি···

শিহরিয়া সুরমা মুখ তুলিল,—বঙ্ক ঠাকুরপো!

মৃদু হাসিয়া সে কহিল,—আসুন…

বঙ্ক ঘোড়া হইতে নামিয়া বারান্দার রেলিঙে লাগামটা জড়াইয়া কহিল—ফণী কোথায়? ফণী……?

সুরমা কহিল—তিনি তো এখানে নেই। মফঃস্বলে গেছেন।

বঙ্ক কহিল—কখন ফিরবে?

সুরমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—তিনিই জানেন।

বঙ্ক বিস্মিত হইল, কহিল—সে কি, আপনি একলা?

সুরমা কোনো জবাব দিল না, মুখ নামাইল। একটা নিশ্বাস… অতি কষ্টে সে তা রোধ করিল। বুকের মধ্যটা সে নিশ্বাসের বেগে দুলিয়া উঠিল।

বঙ্ক কহিল,—তাহলে আসি……

সুরমা কহিল—একটু বসুন, চা খান্—চা খেয়ে যাবেন'খন!

বঙ্ক সুরমার পানে চাহিল,—তার ভিতরকার পুরুষ জাগিয়া শুধু

দেখিল, এক নারী···তার চিত্তের চির-রহস্থে-ঘেরা নারী, তরুণী নারী—এইটুকু মাত্র! · এর বেশী আর কোনো কথা মনে জাগিল না। সে কহিল—বেশ! চা-ই পান করা যাক্! ·····

বারান্দায় ক'খানা বেতের চেয়ার ছিল—তারি একখানায় সে বসিয়া পড়িল। সুরমা ডাকিল—মথুরা

মথুরা আসিল। সুরমা কহিল—চা···এক পেয়ালা···

বঙ্কু কহিল—সে কি···আপনি খাবেন না?

সুরমা কহিল—আমার তো সন্ধ্যাবেলায় চা খাওয়ার অভ্যাস নেই!

বঙ্কু কহিল—তাহলে থাক্···আমাব জন্য শুধু···

সুবমা কহিল—আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও খাবো। বলিয়া সে মথুরার পানে চাহিল। মথুবা একদৃষ্টে বঙ্কুর পানে চাহিয়া ছিল। সে তো দৃষ্টি নয়, যেন তীবের ফলা! সুবমা কহিল—দু' পেয়ালাই তৈরী করিস্···

মথুরা নির্ব্বাক্ ভঙ্গীতে চলিয়া গেল।

বঙ্কু কহিল—একলাটি সময় কাটাচ্ছেন কি করে ··? এই নির্জ্জন বনবাসে··· ?

সুরমাব কি মনে হইল, হাসিয়া সে কহিল—আপনিও তো একলা···

হাসি নয় ও বিদ্যুৎ! বঙ্কুর সমস্ত প্রাণ ভরিয়া আলো ছিটাইয়া যেন বিজলী ছুটিয়া গেল! বঙ্কু কহিল—আমার কাজ আছে···

সুরমা অপ্রতিভ হইল। মনও সঙ্কোচে সারা হইয়া গেল,—সত্যই তো দুম্ করিয়া এ প্রশ্ন সে করিল কি ভাবিয়া! সে কহিল—আমারো সংসার আছে তো। মেয়েমানুষ কি কাজ ছাড়া থাকে কখনো? বলুন,···না, কাজের তার কামাই আছে? ··

বন্ধু আবার সুরমার পানে চাহিল। কি দেখিল, সে-ই জানে! এ-বার কি বলিতে গিয়া সুরমা সে দৃষ্টির স্পর্শে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তার কণ্ঠে স্বর ফুটিল না। দৃষ্টিটা কেমন ভালো ঠেকিল না! চিরদিন পর্দ্দার মধ্যেই বাস করিয়া আসিয়াছে…একটা সংস্কার—সংস্কারের ক্রিয়া সামান্য নয়!……

বন্ধু কহিল—খাসা গাইতে পারেন কিন্তু আপনি…আমার সে গানের লোভ এমন প্রচণ্ড জাগে · কিন্তু উপায় নেই। কাজের অন্ত নেই·· অর্থাৎ এই পাথরের ঢিপি-চাপা কেটে ভালো পাথর তুল্‌তে হবে· ভাবুন তো, পাথর ভাঙ্গার মজুরী যাকে করতে হয়, তার কি সুরের চাষ পোষায়?

বন্ধু থামিল। খ্যাতির কথায় সুরমার সঙ্কোচ-কুণ্ঠা যেন একটু হটিল। সে কহিল—শেখবার ইচ্ছে খুব আছে, কিন্তু এ বনবাসে শিখি কি করে…কার কাছেই বা শিখি? উনি কত বলেন

বন্ধু কহিল—বেশ তো, আমার যেটুকু বিদ্যা আছে,—যদি অনুমতি করেন, গুরুগিরি নয়, মানে, বন্ধুর প্রীতিমাত্র…

সুরমা সলজ্জভাবে কহিল—বেশ, উনি ফিরুন…

বন্ধু আবাব চুপ করিল। আলাপের মধ্যে অনুপস্থিত জীবটির উপস্থিতি মুহূর্ত্তে যেন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। বেসুরা!…চা আসিল; সুরমা পেয়ালায় চা ভরিয়া আগাইয়া দিল। হাসিয়া বন্ধু কহিল—Ladies first.

সুরমা হাসিল, হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, এ পেয়ালা আমার থাক্। আপনি চিনি বেশী খান?

বন্ধু কহিল—বেয়ারার উপরেই নির্ভর করে আসচি চিরদিন ··চিনির ওজন কখনো ঠিক থাকে তাতে?

সুরমা আবার হাসিল, কহিল—আচ্ছা। দু' পেয়ালা চিনি দিলুম, —দেখুন তো যদি আরো দরকার হয়··

বঙ্কু কহিল—চায়ের নেশা লাগিয়ে দিচ্ছেন, অতিরিক্ত মিষ্টতায় তাকে ভরিয়ে তুলে···লোভে পড়ে দু'বার তিনবার আসতে হবে, দেখচি!

সুরমার সর্ব্ব দেহ তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে শিহরিয়া উঠিল। নিজেকে তখনি সে ভৎসনা করিল,—তুচ্ছ এক পেয়ালা চা, তার জন্য···কি ভীরু— এমন ছোট মন তার!

৩

চায়ে বঙ্কুব সত্যই নেশা লাগিয়া গেল। ঠিক যে চা·· তা বলা চলে না। চা তো এতকাল বঙ্কুর বয়ই তৈরী করিয়া আসিতেছে। সে চায়ে খুঁৎ বঙ্কু কোনোদিনই পায় নাই। এখন সে চা ভালো লাগে না। চায়ের পেয়ালার সঙ্গে সঙ্গে এই যে তরুণীর হাসির বিদ্যুৎ, কথায় এই সুরের আলাপ ··তার মোহ অনেকখানি! কাজেই ভোরে উঠিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া এই ক' মাইল আসিয়া চা খাইতে হয়। চায়ের সঙ্গে এমন একটা আবেশ তার সারা মনকে ঘিরিয়া বসে—কত কথা হয়, কত গল্প, কত হাসি···গানও!

কি করিয়াই যে আগে তার সময় কাটিত! নিঃসঙ্গ নীরস জীবনে সুরের রস এখন একেবারে উথলিয়া বহিতেছে!

সুরমারই বা কাজ কি! এটা-সেটা গুছাইতেছে, একটা টেবল্ তিনবার ঝাড়িতেছে, এ-চেয়ারখানা নাড়িয়া একবার ওদিকে রাখিতেছে, আবার পরক্ষণে সেটাকে এদিকে টানিয়া আনিতেছে। সেলাই, বোনা, নয়তো চিঠি লেখা,···সেদিন সে পশম লইয়া কাভি৯ট্রঁ

জ্যাকেট তৈরী করিতেছিল। বঙ্কু আসিয়া কহিল—বৌদির গুণের দেখচি সীমা নেই···ফণী কি সৌভাগ্যই করেছিল···! লজ্জায় সুরমার কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল।

বঙ্কু কহিল—আপনার হাতের পরশ নিবিড় হয়ে ফণীর অঙ্গে লেপে থাকবে···এ চমৎকার আইডিয়া! সুরমার আরো লজ্জা হইল—সে মুখ নামাইয়া কাঠি লইয়া জামা বুনিতে লাগিল, কোনো কথা কহিল না।

বঙ্কু কহিল—আমাকেও একটি জামা তৈরী করে দিতে হবে বৌদি—আমি পশম আনিয়ে দেবো··

সুরমা কহিল—পশম আনিয়ে দিতে হবে না—ঢের আছে। এঁরটা হয়ে যাক, দেবো তৈরী করে। একটা মাপ দেবেন,—হাতের, ছাতির···

বঙ্কু কহিল—সে আমি কি করে মাপ দেবো! আপনি বরং···

সুরমা কহিল—আচ্ছা···

সুরমা বুনিতে লাগিল। বঙ্কু উঠিল, উঠিয়া হার্মোনিয়মের সামনে গিয়া বাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গান ধরিল,—

'প্রচুর তপন-তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে,
বায়ু করে হাহাকার।
দীর্ঘ পথের শেষে ডাকি মন্দিরে এসে
খোলো খোলো খোলো দ্বার।···

··· ··· ···

বুকে বাজে আশাহীনা
ক্ষীণ-মর্ম্মর বীণা,
জানি না কে আছে কি না, সাড়া তো পাই না তার!'···

সুরমার কাণে আসিয়া সুরগুলা আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। সে এক-মনে জামা বুনিতে লাগিল। বঙ্ক আবার গান ধরিল,—

'জাগরণে যায় বিভাবরী ;
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি
মরি মরি !
যার লাগি ফিরি একা একা,
আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,
তারি বাঁশী ওগো তারি বাঁশী
তারি বাঁশী বাজে হিয়া ভরি
মরি মরি !'

এ সুর আসিয়া সুরমার প্রাণটাকে তীরের মত বিঁধিল ! এ তারি মনের কথা…! চোখের সামনে কোন্ অজানা পথে ফণী চলিয়াছে… সুরমার ব্যাকুল দুই নয়নের দৃষ্টি তার পিছনে…ফণী তা দেখিতেও পায় না ! কি করিয়া তাকে এমন নিঃসঙ্গ একলা ফেলিয়া এমন করিয়া আছে…? ওগো, আমার দিন যে আর এখানে কাটিতে চায় না ! এই নির্জ্জন বন-তলে—যার লাগি ফিরি একা একা, আঁখি পিপাসিত, নাহি দেখা…বুক যে সত্যই ফাটিয়া যায় ! সুরমা হাতের কাজ ফেলিয়া মুগ্ধ চিত্তে গান শুনিতে লাগিল। তার দুই চোখে জল ছাপাইয়া আসিল। সেদিকে তার খেয়ালও নাই। বঙ্ক গাহিতেছিল· ·

'এই হিয়া ভরা বেদনাতে
বারি ছলছল আঁখিপাতে
ছায়া দোলে তারি ছায়া দোলে…
ছায়া দোলে দিবানিশি ধরি…'

সুরমার চোখের সামনে সব আলো নিবিয়া গেল। অশ্রু-ভরা চোখের সামনে ছায়া,…কেবলি ছায়া…দীর্ঘ ছায়া, পাখীর ডানার মত…

হঠাৎ তার চেতনা ফিরিল, বঙ্কু বলিতেছিল,—এ কি বৌদি, দু' চোখে জল যে· এঁ্যা…

• সুরমা অপ্রতিভ হইয়া কহিল—না। আঁচলে সে চোখ মুছিল, মুছিয়া হাসিল।

বঙ্কু তার হাত ধরিয়া কহিল—না, কান্না-টান্না নয়…

সুরমা সবলে বঙ্কুর হাত ছিনাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—চা আনি…

বঙ্কু কহিল—চা থাক্…চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্…

সুরমার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। সঙ্গ নয়, গল্প নয়,—কিছু নয়! একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেই যা-কিছু আরাম!

বঙ্কু কহিল,—উঠে পড়ুন, ··ভাবচেন কি! আজ এখন আমার কাজেরো কোনো তাড়া নেই…

সুরমা না বলিতে পারিল না। স্বামীর বন্ধু…অতিথি! সে উঠিল।

ফটকের কাছে মথুরা আসিয়া কহিল,—সঙ্গে যাবো?

সুরমা কিছু বলিবার পূর্ব্বেই বঙ্কু কহিল—কেন? কোনো দরকার নেই—তুই বাপু বাড়ী চৌকি দে··

মথুরা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরমাকে সঙ্গে লইয়া বঙ্কু বাহির হইয়া গেল। মথুরা স্থির দৃষ্টিতে তাদের পানে চাহিয়া রহিল,—ঝোপের ওধারে তারা দৃষ্টির অন্তরালে অদৃশ্য হইলে মথুরা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের কাজে ফিরিয়া আসিল।

৪

সুরমার অস্বস্তির সীমা ছিল না। রাগও ধরিতেছিল। ফণীর চিঠি আসিয়াছে। ফণী লিখিয়াছে,—আরো এক-হপ্তা বোধ হয় ফিরতে

পারবো না। একলা তোমার কষ্ট হচ্ছে, না? কিন্তু এবার তত কষ্ট হওয়া উচিত হবে না। একজন সঙ্গী দিয়ে এসেচি···আশা করি, বন্ধু প্রায়ই যায়। তোমরা দুজনে এ'র মধ্যে দেশটার কোথায় কি আছে, ঘুরে আবিষ্কার করে রাখো। আমি গেলে দেখিয়ো। সঙ্গীত-চর্চ্চা চলছে তো? খবদ্দার, বন্ধ দিয়ো না। বন্ধুকে পাকড়ে যতখানি পারো, সুর তার কাছ থেকে আদায় করে নাও। লোকটা সুরের ভাণ্ডারী। আমায় খুব গাল দিচ্ছ, বোধ হয়। কিন্তু ওগো মানিনী, আমার মনে প্রতি মুহূর্ত্ত তুমি বিরাজ করছো।

ছোট্ট চিঠি! কে চায়। সঙ্গীত-চর্চ্চা করো·· হায় পুরুষ, এ সঙ্গীত-চর্চ্চা কি তার নিজের সখের জন্য···? তাছাড়া তোমার বন্ধু যত সুরের কারবারই করুক, পুরুষ মানুষ, তাকে যখন-তখন গানের ফরমাশ করিতে তার বুঝি লজ্জা করে না? কি যে বলো! এবার এমন কড়া চিঠি লিখিব···না, তা কেন, চিঠি লিখিবই না·· দেখি, তোমার চাকরিব মায়া বড়, না,···

সুরমা আর ভাবিতে পারিল না—বেদনাতুর মন ঐ পথ ধরিয়া আবার কোন্ অজানা গৃহের দ্বারে ছুটিয়া চলিল···কিন্তু অজানার মাঝে কোনো হদিশই মেলে না যে!···

পূর্ণিমা। সন্ধ্যা না হইতেই মস্ত চাঁদ আকাশে আসিয়া দেখা দিল। সে যেন ঐ বড় গাছটার আড়ালে লুকাইয়া সুরমাকেই লক্ষ্য করিতেছিল! · সুরমার মন উতলা হইয়া উঠিল। সুরমা হার্ম্মোনিয়মের পাশে বসিয়া গান ধরিল,—

এমন চাঁদিনী, মধুর যামিনী···
সে যদি গো শুধু আসিত···

সহসা বঙ্কু আসিয়া উপস্থিত। সুরমা তাড়াতাড়ি গান থামাইয়া উঠিয়া পড়িল।

বঙ্কু কহিল—অন্যায় করেচি। না এসে লুকিয়ে থাকলে সুরলোকের বার্ত্তা পেতুম···! সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সুরমা কহিল—চা আনাই···

বঙ্কু কহিল—আঃ, কেবলি চা, চা, চা · আমি কি এমনি চায়ের নেশায় মশ্‌গুল? না, সেইজন্যেই আসি ··?

সুরমা কোনো কথা না কহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্কু কহিল—এমন চাঁদের উদয় দেখে মনটা কাতর হয়েচে,·· না বৌদি?

কথাটা যেন চাবুকের মত···সুরমার ভারী লজ্জা হইল!

বঙ্কু কহিল—ফণীটা কি গাড়োল! গাড়োল বলি কেন! এ রীতিমত নিষ্ঠুরতা! পয়সার নীচ গোলামি! এমন রাত্রিটা কি কতকগুলো বর্ব্বর ধাঙড়ের সঙ্গে কাটাবার জন্য তৈরী হয়েছিল! তা ভাবনা কি, বৌদি? চলুন, আমরা দুজনে আজকের এই জ্যোৎস্নায় সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বেড়াই···

মথুরা আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, কহিল—চা আনবো?

বঙ্কুর আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, হতভাগা, বেয়াদব!

সুরমা কহিল—চা থাক্‌···

মথুরা একটা ঝাড়ন লইয়া টেবিল চেয়ার ঝাড়পোঁছ করিতে লাগিল। বঙ্কু বিরক্ত হইল। সে বসিল, বসিয়া বলিল—চা ফরমাশ করুন, বৌদি···

সুরমা কহিল—আমি নিজেই যাচ্ছি···

বঙ্কু কহিল—ঐ জন্যেই তো চায়ে অরুচি ধরে! আপনাকে কষ্ট করতে হয় যদি তো থাক্‌ চা···

সুরমা কহিল—মথুরা, চা···

মথুরা একবার দুজনের দিকে চাহিল—কঠিন দৃষ্টি! তারপর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সুরমা তার সেলাইয়ের কাজ পাড়িল। আজ সে একটা টাই বুনিতেছিল। বঙ্কু কহিল—ফণীর জন্যে, বুঝি?

সুরমা জবাব দিল না। বঙ্কু একটা নিশ্বাস ফেলিল; তারপর কহিল—আমি আপনাকে উল আনিয়ে দেবো বৌদি। দয়া করে একটা বুনে দেবেন আমার জন্যেও···আপনার প্রীতি গলায় জড়িয়ে দেশে দেশে ফিরবো···

সুরমা শিহরিয়া উঠিল। এ কথার অর্থ···? সে একটু ত্রস্তভাবেই বঙ্কুর পানে চাহিল। বঙ্কু হাসিয়া কহিল—মানে, আপনাদের স্নেহ আমার মস্ত সম্পদ যে এ নিরালা বনবাসে···

সুরমা কহিল—উল এনে দিতে হবে না। এঁরটা হোক্, হলে আপনাকে একটা টাইও বুনে দেবো·

বঙ্কু কহিল—ধন্যবাদ বৌদি···

সুরমা কহিল—আপনি বিনয়-প্রকাশটা একটু কম করবেন,··· বলিয়া হাসিল।

বঙ্কুর মনে হইল, ও হাসি যেন কোন্ অমরার দ্বার খুলিয়া দিল, সেখানে শুধুই আলো, গান, হাসি আর আনন্দ! বেচারা, বেচারা সে ···হতভাগা···! তার জন্য টাই মিলিবে···কিন্তু আগে ফণীরটা তৈরী হোক, তারপর···! ফণী···the lucky dog!

সুরমা টাই বুনিতেছিল। গাছ পালার পাতা দোলাইয়া বাতাস বহিতেছিল,—গাছের পাতার আড়ালে চাঁদের উঁকি-ঝুঁকি···

বঙ্কু নিবিষ্ট মনে সুরমার পানে চাহিয়া ছিল। তার কণ্ঠস্বরত দুই

বাহু···নিটোল সুগোল হাত দুখানি···বাতাসের দোলা পাইয়া ললাটের উপর চূর্ণ কুন্তলের উদাস খেলা, চোখে সলাজ চাহনি-ভঙ্গী···বঙ্কুর মন এ-সবের মধ্যে কি মাধুরীর স্বাদ পাইয়া তন্ময় বিভোর··চোখ তার আর ফেরে না···কণ্ঠ নীরব !···

এ চোখের দৃষ্টি সুরমার অলক্ষ্যে তার দেহে-মনে একটা অস্বস্তির শিহরণ হানিতেছিল ! কি এ দায়—মুক্তিও তো নাই।

কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। এমনি করিয়া বহুক্ষণ কাটিল। চায়ের পেয়ালা আসিল,—পেয়ালা ফুরাইল। মথুরা একধারে দাঁড়াইয়া। সন্ধ্যা কখন্ রাত্রিকে আসর ছাড়িয়া সরিয়া গিয়াছে !···. বাহিরে চাঁদের জ্যোৎস্নায় যেন বান ডাকিয়াছে !···আলোর ছড়াছড়ি

বঙ্ক কথা কহিল, বুক তার দুলিয়া উঠিল। সে বলিল—চলুন, একটু ঘুরে আসা যাক

সুরমা কহিল—রাত হয়ে গেছে যে···

বঙ্কু কহিল—তাতে কি ! In such a night as this...

সুরমা বাধা দিয়া কহিল—না, না, এত রাত্রে···

বঙ্কু কহিল,—তাহলে আপনি একটু গান গাইবেন, চলুন···

সুরমা কহিল—সময় নেই···এখনি কাজের ডাক পড়বে···

বঙ্কু বিরক্ত হইয়া কহিল—আঃ, কেবলি কাজ, কাজ, কাজ ··

সুরমা একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিল—আপনি গান গান না··· আমি শুনি···

বঙ্কু কহিল—আচ্ছা, সেই কাজই করা যাবে। আজ পূর্ণিমার মান রাখবো গানে !···আমার একটু কাজ আছে, সেরে নি···তার পরে আসবো'খন···

সুরমা কহিল—আসবেন।—কথাটা বলিয়া সে তখনি জিভ কাটিল! আরো বেশী রাত্রে···?

সুরমার স্বরে উৎসাহের একটা আবেগ ছিল। বঙ্কু তাহা লক্ষ্য করিয়া খুশী হইল। সে কহিল—আসবো···তবে রাত প্রায় এগারোটা হবে···

—এ—গা—রোটা! সুরমা কহিল—তবেই হয়েচে! আমি তখন গাঢ় ঘুমে ঘুমিয়ে থাকবো। জানেন না তো, আমি কি-রকম ঘুম-কাতুরে···উনি কত রাগ করেন!

আবার উনি! ফণীর ছায়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল! বঙ্কু বিরক্ত হইল। সে কহিল,—না, না, না—আজকের এ রাত্রি ঘুমের জন্য নয়···

সুরমার মাথার মধ্যে রক্তটা ছলাৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল—তবে···?

বঙ্কু কহিল—গান, গল্প,—বুঝলেন? তার কথার স্বর আপনা হইতেই মৃদু হইয়া উঠিল। সে কহিল—বেশ, ঘুমিয়েই যদি পড়েন, তবু দরজা খুলে রাখবেন,—আমি গান গেয়ে ঘুম ভাঙ্গাবো'খন···সেই গান—ও নলিনী, খোলো না আঁখি, ঘুম এখনো ভাঙ্গিল না কি···

এ সব কি কথা, আবার!···সুরমা কথা কহিল না, শিহরিয়া সে কি ভাবিতেছিল···

বঙ্কু কহিল—এই রাত্রে গানের আসর খুব জাগিয়ে দেওয়া যাবে। তাহলে দরজা খুলে রাখচেন তো···?

সুরমা কহিল—আমার দায় পড়েচে···শেষে চোর-টোর আসুক··· বাবারে, তাহলে ভয়েই মরে যাবো···

বঙ্কু কহিল—না বৌদি,···সে সরিয়া সুরমার হাত ধরিল···সুরমা হাত ছাড়াইয়া লইল···

বঙ্কু কহিল—তাছাড়া আপনাকে আমার কতকগুলো কথা বল্‌বো …প্রাণের দারুণ বেদনার কথা· ·কেউ জানে না ··

সুরমার বুকখানা কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল।

বঙ্কু কহিল,—অনুমতি দিন…

সুরমা কহিল—না,—রাত এগারোটায় আসতে হবে না

বঙ্কু কহিল—কেন? বঙ্কুর চোখ দুইটায় কিসের আগুন জ্বলিতেছিল! কি এক গূঢ় অভিসন্ধি তার মাথায় খেলিতেছিল…

বঙ্কু আবার কথা কহিল—আপনি দরদী…আমার কথা আপনাকে শুনতেই হবে। আর তা শোনার যোগ্য সময় আজকের এই রাত্রি। আমি আসচি…আমায় আসতেই হবে…এখন উঠলুম তবে…

মথুরা চাকরটা তার পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—যেন এক কঠিন পাথরের মূর্ত্তি!—বঙ্কুর দৃষ্টি তার সে দৃষ্টির সঙ্গে মিশিল—মুহূর্ত্তের জন্ম মাত্র…সে তা গ্রাহ্যও করিল না।

সুরমা কহিল—আপনি আসবেন না…এলে দেখা হবে না ··

বঙ্কু সুরমার পানে চাহিল…চোখে মিনতির রাশি! সুরমা কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইল না; পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বঙ্কু একবার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল, তার পর চুপ করিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া কি ভাবিল—তারপরে টলিতে টলিতে বাঙলোর বাহিরে আসিয়া ঘোড়ার লাগাম খুলিল। লাগাম ধরিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল—ঘোড়া মুখ ফিরাইয়া চলিল।…

সুরমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পূর্ণিমার ঐ জ্যোৎস্না নিমেষে ঝাপ্‌সা কালো হইয়া উঠিয়াছে! সে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিল, আসিয়া দেখিল, ঐ যে ঘোড়া, ঝাউ গাছটার সামনে·· সে ডাকিল,—মথুরা…

মথুরা আগাইয়া আসিল। সুরমা কহিল—দৌড়ে যা, বাবুকে বল্‌গে যা, আসবেন এগারোটার সময়। দরজা খোলা থাকবে।

মথুরা এমন এক দৃষ্টিতে সুরমার পানে চাহিল···সুরমা সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল না; বলিল—যা শীগ্‌গির্‌···

মথুরা বিনা-বাক্যব্যয়ে ঘোড়ার পিছনে ছুটিল···সুরমা সেই দিকে চাহিয়া···ঐ যে মথুরা···ঘোড়া থামিল। মথুরা কি বলিল; বঙ্ক ফিরিয়া চাহিল,···সুরমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলিল। বঙ্ক হাসিল · সে হাসিতে সুরমার বুকের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল···নিজেকে কোনো-মতে টানিয়া আনিয়া শয্যার উপর সে লুটাইয়া দিল—দুই চোখে তার ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল—উপায় নাই, উপায় নাই!··· দারুণ নিরুপায়েই তাকে আজ···

ফণীর উপর তার রাগ ধরিল···তোমারই জন্য এত বড় অপমান মাথা পাতিয়া লইতে হইয়াছে···

মথুরা আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—বাবু আসবেন।

কথাটা কানে আসিয়া লাগিল···খুব দূরে বাজ পড়িলে সে আওয়াজ যেমন কানে আসিয়া লাগে, তেমনি যেন···

চোখ মুছিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল। মথুরার ত্যক্ত দেহ তখন ঘর হইতে সরিয়া যাইতেছে!···

৫

বাঙলোর ভিতরটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন; বাহিরে জ্যোৎস্নার রাশি! বন্ধ ঘরের দ্বার খোলা। সেই ঘরের মধ্য দিয়াই সুরমার শয়ন-কক্ষে যাইতে হয়। বাহিরে গাছপালার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্নার লুকোচুরি খেলা চলিয়াছে!···আলো-ছায়ার যেন ঝালর দুলিতেছে!

সুরমা নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া·· তার বুকের মধ্যে কে যেন ভারী মুগুর মারিতেছে ··বুক বুঝি ফাটিয়া যাইবে ! প্রচণ্ড চাঞ্চল্যে সে সারা হইয়া যাইতেছে !····

বাঙ্লোর পুরানো ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

ওদিককার বড় রাস্তার উপর একটা ছ্যাকরা গাড়ীর ঘোড়ার নাল সহসা খুলিয়া গেল। ঘোড়া চলিতে চায় না। সাহেবী পোষাক-পরা আরোহীকে কাকুতি জানাইয়া গাড়োয়ান কহিল, ঘোড়া তার আর নড়ে না! আরোহী কহিল,—বেশ, এখান থেকে কতটুকুনই বা তোর ভাড়া নে, আমি হেঁটে যাবো—জ্যোৎস্না আছে। বলিয়া আরোহী নামিয়া পড়িল; সঙ্গে একটা হোল্ড-অল্ মাত্র। সেটা হাতে লইয়া গাড়ীর ভাড়া চুকাইয়া সে বাড়ীর পথে চলিল।

আরোহী ফণী।

তার মুখে হাসি। ভাবিল, বেশ হইবে! সুরমা আশাও করে নাই!···অঘোরে ঘুমাইতেছে! একেবারে একটি চুম্বনে তার ঘুম ভাঙ্গাইবে, আর সে···হঠাৎ কাজ শেষ হইয়া গেল—বাড়ীর জন্য মনটা বড় অধীর। তাই সে ট্রেন পাইয়া গৃহে ফিরিতেছে। ইচ্ছা করিয়াই কোনো খবর দেয় নাই! দিবার সময়ও ছিল না। আর একবার খবর না দিয়া এমনি রাত্রে সে ফিরিয়াছিল···আনন্দ যা মিলিয়াছিল, তার স্মৃতি এখনো তাকে উন্মাদ করিয়া তোলে!

বেচারী একা ঐ বনের মধ্যে থাকে···কার সঙ্গেই বা কথা কহিবে· এই বয়সে···! এবার তবু বন্ধু আছে—নহিলে ফণী কি বোঝে না, তাকে কাছে না পাইয়া সুরমার কি কষ্টে দিন কাটে! কিন্তু উপায় যে নাই! থাকিলে সে সুরমাকে সঙ্গে লইয়াই ফিরিত তো।······

ঐ বাঙলো দেখা যায়—জ্যোৎস্নার চাদর মুড়ি দিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া

আছে…ওই বাঙলো—উহার মধ্যে তার প্রাণের যত হাসি, যত আনন্দ! বুক তার ফুলিয়া উঠিল, অধীর উন্মাদনায়…

হোল্ড-অলটা বারান্দায় ফেলিয়া সে দেখে, ড্রয়িং-রুমের দ্বার খোলা। বাঃ, চমৎকার…কাহাকেও ডাকিয়া তুলিতে হইবে না…! নিঃশব্দে খোলা দ্বার দিয়া সে ড্রয়িং-রুমে ঢুকিল।

…কঠিন হস্তে গলা কে চাপিয়া ধরিল! আচম্‌কা এ আক্রমণে ফণীর কথা কহিবার শক্তি উবিয়া গেল। যে প্রবল শক্তি তার গলা চাপিয়া ধরিয়াছিল, সে অমনি-ভাবেই তাকে টানিয়া বাহিরের বারান্দায় আনিল; প্রবলভাবে ঝাঁকানি দিয়া কহিল—শয়তান্…

এ যে মথুরা…! ফণী চমকিয়া কহিল—করিস্ কি মথুরা…? আমি। চোর নই!

এ্যা! ঠিক—মনিবই! মথুরা চমকিয়া উঠিল।

—আপনি…? মথুরা ফণীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল, পর মুহূর্ত্তে চাপা গলায় কহিল,—এই নিন্ আপনার বন্দুক…

কোমর হইতে তারি রিভলভারটা টানিয়া ফণীর হাতে দিয়া মথুরা কহিল,—এই নিন্… দরকার আছে। ভারী বিপদ…

ফণী চমকিয়া উঠিল। বিপদ! কি বিপদ যে…সে কহিল,—তোর বহু-মা?

মথুরা কহিল,—বহু-মাই—ঐ সাহেব বন্ধু…বন্ধু বাবু…রাত এগারোটায় আসবে। আমি তাই চুপ করে দাঁড়িয়েছিলুম—যেমন আসবে, অমনি…আমার সহ্য হয় না, বাবু…

মথুরার স্বরে কি ঝাঁজ! তার সর্ব্বশরীর রাগে কাঁপিতেছে!…

ফণী শিহরিয়া উঠিল! মথুরা এ বলে কি? তার বন্ধু বন্ধু…আর সুরমা? পায়ের তলায় মাটীটা দুলিয়া উঠিল!

মথুরা কহিল,—এখনি ··নিজের চোখে দেখতে পাবেন, বাবু। মথুরা বেশ কাঁপিতেছে···

কিন্তু না—মথুরার এ-সব কথা ! স্পর্দ্ধার তার সীমা নাই ! সরোষে ফণী কহিল,—চুপ কর্। তুই শয়তান্ ·

মথুরা কহিল—আমায় ছুটী দিন · আপনার ঘর, আপনার ইজ্জৎ··· আমি চৌকি দিয়েচি···কিন্তু আর পারি না···

—আচ্ছা, তুই যা···বলিয়া ফণী দারুণ ঘৃণায় মথুরাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিল। ধাক্কা খাইয়া মথুরা একদিকে সরিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

বাহিরে জ্যোৎস্নার রাশি ··আকাশ যেন এত জ্যোৎস্না আর ধরিয়া রাখিতে পারে না ! অজস্র দানে পৃথিবীকে ভরিয়া তুলিয়াছে !··· চকিতে ওই শুভ্র অমল জ্যোৎস্নার রাশিতে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল ···চারিদিক গাঢ় কালো কালিতে ভরা ··

ফণী বসিয়া পড়িল। তার সোনার স্বপ্ন·· প্রাণের যা-কিছু আরাম··· এমনভাবে খোয়া যাইতে বসিয়াছে ! এত বড় দুনিয়ায় সে কি লইয়া থাকিবে !···সমস্ত পৃথিবীটা দুলিতে দুলিতে কোন্ রসাতলে যেন নামিয়া চলিয়াছে ! ফণীর মাথা ঘুরিতেছিল। সে জাগিয়া আছে, না, একটা ভীষণ তীব্র দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে ?

দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ !···সে চাহিয়া দেখিল ·অস্পষ্ট একটা কালো রেখা অগ্রসর হইয়া এই দিকেই আসিতেছে। স্বপ্ন নয় ! রিভলভারটা সে হাতের মুঠিতে ভরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, · তাই, দ্বার তাই খোলা বটে ! এত-বড় শয়তানীও সম্ভব ? মন প্রাণপণে হাঁকিতে লাগিল, না, না, না···কিন্তু ঐ ঘোড়ার পায়ের শব্দ···! ফণীর মনে হইল, এই বন্দুকের গুলিতে দুনিয়াটাকে যদি সে ছিঁড়িয়া ফাঁসাইয়া চূর্ণ করিয়া দিতে পারে !···

খোলা দ্বার দিয়া ড্রয়িং-রুমের মধ্যে ঢুকিয়া এক কোণে সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চারিধার নিশুতি। কোনো সাড়াশব্দ নাই··· বহুদূরে কোন্ পাড়ায় একটা কুকুর শুধু বিশ্রী রব তুলিতেছিল···দুনিয়ার এই শয়তানী দেখিয়া বুঝি কুকুরটা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে! নহিলে এমন চীৎকার তুলিবে কেন?

বাঙ্‌লোর বারান্দায় একটা খস্-খস্ শব্দ··অতি-সতর্ক কার মৃদু গতি! ফণীর অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া উঠিল,—শয়তান্!···হাত দুটা নিশ্‌পিশ করিতে লাগিল। জোর করিয়া পিস্তলটা পকেটে ফেলিয়া সে দুই হাত বুকের উপর মুঠি ভরিয়া চাপিয়া ধরিল।

ঐ যে দ্বারে মানুষের ছায়া!—চোর, ডাকাত, শয়তান···

কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ফণী দেখিল,···বন্ধুর মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি ড্রয়িং-রুম পার হইয়া সতর্ক গতিতে · ঐ যে সুরমার ঘরেই চলিয়াছে! একবার মনে হইল, এ কি আবার দুঃস্বপ্ন দেখা চলিয়াছে, না, সত্যই তার চোখের সামনে এত বড় প্রলয়ের ব্যাপার ঘটিতেছে···? তার স্ত্রী সুরমা তার জীবনের ধ্রুবতারা···তার সর্ব্বস্ব সুরমা···একটা চোরের সঙ্গে তার এমন ষড়্ হইয়া গিয়াছে··? বুকের মধ্যটা দুপ্ দুপ্ করিতেছিল···তবু সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল···আরো কি হয়···এর পরে? ··কতদূর ঘটিতে পারে, দেখা যাক্! দুই চোখ যেন এর মধ্যে খসিয়া না পড়ে, ভগবান! হুঁশিয়ার!···

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ···ঐ ··আলো জ্বলিল। ঐ না কে কথা কহিতেছে?···হাঁ, ও বন্ধুর স্বর···বন্ধু ডাকিল—সুরমা···সু···সু···

ধড়মড়িয়া কে উঠিয়া বসিল, না? হাঁ...সুরমা! ভগবান, ভগবান, তোমার বাজ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ··! নিষ্ঠুর, তুমিও এ শয়তানী দেখিয়া চুপ করিয়া আছো! বেশ·· বাঃ!

বুকটাকে চাপিয়া ধরিয়া ফণী উৎকর্ণ হইয়া রহিল…সুরমা কথা কহিল না? হাঁ, ও স্বর সে ভালো করিয়াই জানে! শয়নে-স্বপনে ও-স্বর তার বুকের মধ্যে কি গুঞ্জন তুলিয়া, কি প্রীতি ফুটাইয়াই না ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সারাক্ষণ…

সুরমা বলিল—এসেচেন আপনি এই যে! আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম…

তারপর সব চুপ!…বঙ্কু কহিল,—এসেচি আমি…তুমি দরজা খুলে রেখেছিলে…কম্পিত স্বর!

সুরমা কহিল,—হ্যাঁ, বলুন, কি চাই…

বঙ্কু কহিল,—কি চাই…! তারপর কোনো কথা নয়—আবার চুপ!

একটু পরে বঙ্কু কহিল,—চলো সুরমা, এমন রাত্রি… তোমার এই বয়স… এ বয়সে একলা এ নির্জ্জন ঘরে পড়ে থাকা উচিত নয়…তা সাজে না! আমার সঙ্গে চলো, এখনি চলো। দুনিয়া খুব বড়…এত বড় দুনিয়ার এক কোণে দু'জনে আমরা এক অপূর্ব্ব মায়া-লোকের সৃষ্টি করে সেখানে থাকবো…এসো আমার সঙ্গে।

অসহ্য! এইবার…! ফণী পকেটে হাত পূরিয়া পিস্তলটা বাহির করিল…তারপর সতর্ক গতিতে এক পা অগ্রসর হইল…

সুরমা কহিল,—আপনার এই কথা তো? এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন আজ আমায়…? সুরমার স্বর কাঁপিতেছিল। ফণী গতি থামাইয়া দুই কাণ খাড়া করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বুক তার এমন দোলে দুলিতেছিল!

সুরমা আবার তেমনি কম্পিত কণ্ঠে কহিল,—আমারো একটা কথা আছে…আগে শুনুন…

বন্ধু কহিল,—বলো। কিন্তু ওই জ্যোৎস্নার আলোয় বেরিয়ে এসে বললে হতো না…?

সুরমা কহিল,—না, এইখানেই বলতে চাই…এই ঘরে।

বন্ধু কহিল,—বেশ, বলো…

আর এক পা আগাইয়া আসিয়া ফণী কাণ পাতিয়া দাঁড়াইল। সুরমা কহিল,—আমার স্বামী আছেন…সে স্বামী আমার সর্ব্বস্ব—তাঁকে আমার প্রাণের চেয়েও আমি ভালোবাসি…

ফণীর প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল! আঃ! যে-প্রাণ এতক্ষণ জ্বলিয়া পুড়িয়া বেদনায় থাক্ হইতেছিল, সে-প্রাণে এ-কথা যেন অমৃত বর্ষণ করিল!…আঃ…আঃ…!

সুরমা বলিল,—তিনি আপনার বন্ধু…আপনার উপর তিনি ভার দিয়ে গেছেন আমায় আগ্‌লাবার। তাঁর বন্ধু বলেই অসঙ্কোচে তাঁর মান রাখতে আপনার সামনে বেরিয়েচি…গান গেয়েচি, আপনার সঙ্গে মিশেচি, কথা কয়েচি। আপনার অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি ঘট্‌তে দিইনি। যত দূরেই তিনি এখন থাকুন, আমার মন তাঁরি কাছে, সেইখানেই আছে… নিঃসঙ্গ হয়েও সর্ব্বক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গ-সুখে বিভোর হয়ে আছি…তাঁর স্মৃতি অহরহ রক্ষা-কবচের মত আমায় সমস্ত দুর্ভাবনা ভয়-বিপদ থেকে রক্ষা করচে। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি আপনার এ কথা শুনে…ছি…! চোরের মত আপনি এসেচেন আমার কাছে এই নিরালা রাত্রে আপনার ভালোবাসা জানাতে! ভালোবাসার কি অভাব আছে আমার?… কিসের লোভই বা দেখাচ্ছেন! আপনার ও কি ভালোবাসা! স্বামীর ভালোবাসা যে পেয়েচে, ভালোবাসা কি, তা সে জানে…মাতালের নেশায় তাকে ভোলাবেন…? এ কি নীচ জঘন্য স্পর্দ্ধা আপনার…!

অসহ্য আনন্দে ফণীর মনে হইল, বুঝি সে এবার পাগল হইয়া

যাইবে !…এ কথা নিজের কাণে শুনিয়া সে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না…ছুটিয়া সুরমার ঘরে ঢুকিবে ? কৃতজ্ঞতায় তার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া ডাকিবে, সুরমা,…সু…সু…সু ?

কিন্তু না,…এখন নয়…ওই শয়তানটা এখনো দাঁড়াইয়া আছে ! হাতে এই পিস্তল ! রাগের বশে শেষে যদি সে…! একটা অগ্নিকুণ্ড নিমেষে তার চোখের সামনে জল্ জল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল ! মনকে সে বলিল, না

তেমনি কাঠ হইয়াই সে সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিল। পাশের ঘরে আর কোনো রব নাই !…বহুক্ষণ…!

তারপর ছায়ার মত একটা মূর্ত্তি ঘর হইতে ঐ বাহির হইয়া গেল ·· বারান্দায় সে-মূর্ত্তি·· তারপর ঐ ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চলিয়াছে…

ফণীর পা টলিতেছিল…সে নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল·· সে-মূর্ত্তি কখন যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে ! ফণীর কোনো চেতনা নাই !…

চেতনা ফিরিলে পিস্তলটা সোফায় ফেলিয়া ফণী ঘরে গিয়া ঢুকিল। খোলা জানলা দিয়া একরাশ জ্যোৎস্না আসিয়া বিছানায় পড়িয়াছে… সে আলোয় ফণী দেখে, বিছানার উপর সুরমা লুটাইয়া পড়িয়া আছে ! সে··কাঁদিতেছে !…

ফণী তাকে টানিয়া একেবারে বুকে তুলিয়া লইল…

সুরমা শিহরিয়া উঠিল।

ফণী ডাকিল,—সু ·

সুরমা দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া দেখে, স্বামী·· ফণী…স্বপ্ন নয়··

চকিতে একটু আগেকার সমস্ত ব্যাপার তার মনে জাগিল। সঙ্কোচে সে সরিয়া যাইতেছিল ··

ফণী কহিল,—কেমন খপর না দিয়ে এসেচি!…খুব সহজ তার স্বর!

সুরমা ম্লান চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ফণীর পানে চাহিল···ফণী যেন কত দূরে সরিয়া গিয়াছে···!

ফণী তার অধরে চুম্বন বর্ষণ করিয়া কহিল,—এখনো ঘুম ভাঙ্গলো না! বা রে, আমি ক্ষিদেয় জ্বলে যাচ্ছি যে। এখনি খেতে দাও, নাহলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বো···

সুরমা কহিল,—একটা কথা বলবো·· আগে শোনো···

বাধা দিয়া ফণী কহিল,—কোনো কথা নয়! আগে খেতে দাও ···নাহলে কথা শোনবার বা কথা বলবার শক্তি আমার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে! বুঝলে···

সুরমা স্বামীর পানে চাহিল—কি সরল, নির্ভরতার দৃষ্টি ও-দুই চোখে···কি নিরাপদ আশ্রয় এই দুই বাহুর তলে···সে স্বামীর বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া কহিল,—ছাড়ো। ষ্টোভ জ্বালি··· ষ্টোভ জ্বেলে লুচি ভেজে দি···এখনি হয়ে যাবে···

ফণী আবার সুরমার অধরে চুম্বন করিল, কহিল,—এইতো শীতলং পানীয়ং হয়ে গেলো। তুমি লুচি ভাজো, আমি ততক্ষণে বেশভূষা পরিত্যাগ করি······

সুরমা দ্রুত চলিয়া গেল। ফণী তার পানে চাহিয়া,···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে কহিল, না, এ-সম্বন্ধে কোনো কথা নয়! ওগো প্রেয়সী, ও-বুকে অসীম অগাধ প্রেম আছে বলেই পুরুষ স্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গেরও কামনা করে না কোনো দিন! তোমার হৃদয়ের দ্বারে স্বর্গের ইন্দ্রও যে আতিথ্য নেবার জন্য আসতে পারে না, এ-কথা ভালো করে জানি বলেই না—

চিন্তায় বাধা পড়িল। সুরমা আসিয়া ভৎর্সনা করিয়া কহিল,—এখনো দাঁড়িয়ে! নাও, মুখ হাত ধোও—তারপর দেশ-বিদেশের যত

গল্প শোনাতে হবে। আজ আর ঘুমাতে দিচ্ছিনে, মশায়। যাও, যাও শীগ্‌গির…

ফণীর মনটা খুশী হইল! মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার সে কালো মেঘ সুরমার মন হইতে তবে সরিয়া গিয়াছে! আবার সেই চির-পরিচিত হাসি-সুর সুরমার মুখে ফুটিয়াছে,—আঃ! সে তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্ত্তনে অগ্রসর হইল।

সুরমা কহিল,—দাঁড়াও, আমি জুতোর ফিতে খুলে দি…

ফণী পা আর সরাইয়া লইতে পারিল না।…

অন্দর

দাম্পত্য-কলহ শাস্ত্রমতে চিরকাল 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ায়' পরিণত হইলেও এ-ব্যাপারে ফল ঠিক উল্টা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছিল, অর্থাৎ লঘু-আরম্ভে বহু-ক্রিয়া! কি করিয়া কি হইল, খুলিয়া বলি।

শচীন বড় লোকের ছেলে,—লেখা-পড়াতেও বিলক্ষণ তার চাড় ছিল। তারি ফলে পি, আর, এস হইয়া যেদিন এ-বংশের ললাটে সে জয়-টীকা আঁকিয়া দিল, সেদিন হইতে বধূ অমিয়বালার চাঁদের-আলো-ভরা জীবন-আকাশে কালো মেঘ জমিতে স্বরু করিল।

বিবাহের ঠিক পর হইতে এই পি, আর, এসের গণ্ডী-টানার মুহূর্ত্ত অবধি সময়টুকু শচীনের জীবন-গ্রন্থে এক অপরূপ অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছিল। এ অধ্যায়টা খালি হাসি আলো গান আর ভালোবাসায় ভরা! আর এই অধ্যায়ে অমিয়বালা কি রাজেন্দ্রাণীর মূর্ত্তিতেই না নিজেকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে! ইহার পরের অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠায় কিন্তু নির্ম্মম অদৃষ্ট কোথা হইতে একরাশ কালো কালি ঢালিয়া সেটাকে একেবারে অস্পষ্ট করিয়া দিল!

পি, আর, এস হইবার পর সাহিত্য-পরিষদের একদল পাণ্ডা শচীনকে ধরিয়া বসিল, প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ধরুন। দেশের বুকে কীর্ত্তি রাখুন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। আপনার পয়সার অভাব নাই, জ্ঞানের স্পৃহাও এমন—

শচীন মৃদু হাসিল। তার মনশ্চক্ষুর সামনে সমস্ত ভারতবর্ষের গোটা মানচিত্রখানা নিমেষে ফুটিয়া উঠিল! সে মানচিত্রের বুকে ভাঙ্গা

মন্দির, গৃহ-প্রাচীর, মৃত্তিকার স্তূপ আর এখানে-ওখানে কাটার জঙ্গলে ঝোপে-ঝাড়ে কোন্ রাণীর কণ্ঠমালার ভাঙ্গা মুক্তা, কোন্ রাজার মুকুটের ছেঁড়া পালক, তলোয়ারের খাপ, তীরের ফলা ··কালো কাপড়ের বুকে চুম্‌কির মতো হারানো কীর্ত্তির কয়েকটা উজ্জ্বল রশ্মি ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল, আর সে কালো মানচিত্রে চুম্‌কি বসাইতেছে ওস্তাদের বেশে শচীন!

তার পর হইতে শচীন যত হকারের দোকান আর পল্লীর ভাঙ্গা হাটে ঘুরিয়া ছেঁড়া খাতাপত্র ও পুঁথির রাশ সংগ্রহ করিয়া ফিরিল; এবং একটা ঘরে বড় বড় শেল্‌ফ্ গুলা যখন কানি-বাঁধা দপ্তরে ভরিয়া উঠিল, তখন শচীনের চোখের সামনে হইতে সমগ্র বহির্জগৎ তার আলো-হাওয়ার উচ্ছ্বাস, ফুলের গন্ধ-বর্ণ, রূপ-রস প্রভৃতি লইয়া উবিয়া মুছিয়া গেল। এবং শচীন সেই সব দপ্তরের মধ্যে সুগভীর ডুব দিল।

বধূ অমিয়বালার জ্যোৎস্না-রাত্রিগুলা বিফলে কাটিতে লাগিল। বসন্ত আসিয়া তার কুঞ্জদ্বারে ফুলের ডালি রাখিয়া হা-হা করিয়া ফিরিয়া যায়, পাখীগুলা অমিয়র স্তব্ধ-বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া কূজন থামাইয়া নীরব হয়, চাঁদের জ্যোৎস্না ঘুরিয়া ফিরিয়া মেঘের আড়ালে লুকাইয়া পড়ে। অর্থাৎ তার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হইতে বসিল।

অমিয় প্রথমটা মনে ভারী বেদনা পাইয়া শচীনের পাঠ-গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিল; চোখের দৃষ্টি তার অশ্রুর বাষ্পে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল, তবু শচীনের চেতনা নাই! অমিয় ভাবে, স্বামী কি রস পায় ঐ কীটদষ্ট পুঁথি আর ছেঁড়া বইয়ের পাতায় আঁকা কালির অক্ষরগুলায়! শচীন সিগারেট ধরাইয়া, সেই-সব পুঁথি ঘাঁটিয়া একখানা ছোট খাতায় কত সাল-তারিখের হিসাব পাড়িতে

থাকে, একটা সাদা কথারই পাঁচটা প্যাঁচালো ব্যাখ্যা টানিয়া-বুনিয়া বাহির করে, আর কি আশায় তার বুক যে ভরিয়া ওঠে, তা শুধু সে-ই জানে!

অমিয়র দিদি একদিন বেড়াইতে আসিয়া অমিয়কে বকিল; বকিয়া তার রুক্ষ চুলে কুন্তলীন মাখাইয়া দিল, জট-ধরা কেশের রাশি ছাড়াইয়া বেণী কুন্তল রচিয়া দিল; বলিল,—এই মোহিনী মূর্ত্তিতে শিবের ধ্যান ভঙ্গ কর্‌গে যা!

দিদির বক্‌নি ও ঠেলা খাইয়া অমিয় স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। স্বামী তখন মাটি-মাখা উইয়ে-খাওয়া কাঠের ঢিপি ধরিয়া অশোকের কি-একটা কীর্ত্তি-কথা আবিষ্কার করিতে এমন মত্ত যে, অমিয়র পানে চাহিবার তার ফুরসৎ হইল না। অমিয়র চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। অমিয় ছুটিয়া সে-ঘর হইতে আসিয়া গলার ফুলের মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল, মাথার বেণী টানিয়া খুলিল। দিদি বলিলেন,—দেখি, এ যে বিষম রোগ লো! তোর একেবারে রাধা নায়িকার ভাব যে! অমিয় কিছু বলিল না, দুই চোখ মুছিয়া দিদির পানে চাহিল। চোখ দুটো তার ফুলিয়া তখন লাল হইয়া উঠিয়াছে।

দিদি বলিলেন,—এতেই হাল ছাড়লি? এক কাজ কর্‌, শোন্‌ দিকিনি, যা বলি।

দিদির কথা শুনিয়া অমিয় তার হার্ম্মোনিয়ম খুলিয়া বসিল। স্বরলিপির বিস্তর বই জড় করিয়া অহর্নিশি হার্ম্মোনিয়মের মূর্চ্ছিত দেহটাকে অঙ্গুলি-পীড়নে এমন জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল যে, পাশের ঘরে শচীনের পক্ষে পুরানো পুঁথিতে মন রাখা দায় হইয়া পড়িল। সাল-তারিখে গোল বাধিতে লাগিল, পুঁথি-নিবিষ্ট মন হঠাৎ কবে-ভোলা কোন্‌ হারা পথে ছুটিয়া পলাইতে চাহিল। জোর করিয়া টানিয়া শচীন তাকে পুঁথির মলাটে চাপা দিবার প্রয়াস পাইল।

মন যখন পুঁথির চাপে মারা যাইবার মত, তখন হঠাৎ আবার সে মুক্তি পাইল একটা গানের সুরে। অমিয় তখন বাজনার সঙ্গে গান ধরিয়াছে,—

সে যে পাশে এসে বসেছিল
তবু জাগিনি—
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল
হতভাগিনী !...

শচীন বিব্রত হইয়া উঠিল। অশোক বেচারা কত কালের উইয়ের ঢিপি হইতে পরিত্রাণের আশা করিতেছিল, তা ঘটিল না। সে আজ ঐ গানের আড়ালেই বুঝি চাপা রহিয়া গেল !

কিন্তু না। এ দুর্ব্বলতা ! মনকে টিপিয়া সে ঐ পুঁথির মধ্যেই গুঁজিয়া রাখিল। ফলে অশোকের উদ্ধার তো হইলই না, মনটা মাঝে হইতে বেদনায় আহত হইতে থাকিল।

শচীন উঠিয়া গাড়ী জুতিয়া তখনই ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে ছুটিল, সেখানে কেতাবের আব্‌হাওয়ায় মনের এ চাঞ্চল্য যদি মুছিয়া আসিতে পারে !

পরদিন ঠিক ঐ ব্যাপার ! হার্ম্মোনিয়ম নির্দ্দয় পীড়নে মর্ম্মভেদী ঝঙ্কার তুলিয়াছে, আর তার সে-সুরে কিছুমাত্র দরদ না করিয়া অমিয় যেমন-ইচ্ছা গাহিয়া চলিয়াছে। শচীন উঠিল, ভাবিল, অমিয়কে বলিয়া আসে, কোমল-মিহি সুরের উপর সহসা এ অত্যাচার কেন !...কিন্তু সে-ই তো সখ করিয়া বাজনা কিনিয়া দিয়াছে, এবং সে-ই শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া তাকে গান শিখাইবার জন্য একদিন কত না পীড়াপীড়ি করিয়াছে ! এখন থামাইতে যাওয়া ভারী বিশ্রী দেখাইবে !

তিন-চার দিন এমনই সুর-সংগ্রাম চলিল। হঠাৎ শচীনের মনে

হইল, সুরের উপর অমিয়র মমতা থাকা দূরে থাক্, তার ইচ্ছাকৃত অত্যাচার ক্রমেই সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে!

স্তব্ধ দুপুরের বেলা এই সুরের দোলা পাইয়া কেমন তন্দ্রাতুর হইয়া আসিতেছিল! অশোক তাঁর প্রাচীনতার গাম্ভীর্য্যের আড়াল ছাড়িয়া কিছুতেই এ হাল্‌কা আব্‌হাওয়ার মধ্যে বাহির হইতে চান্ না!

শচীন একটু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এ ঘর ছাড়িয়া অন্য ঘরে যাওয়া সহজ কথা নয়। এই বড় বড় শেল্‌ফ্‌গুলাকেও লইয়া যাইতে হয়! এই ছেঁড়া পাতা-ঝরা পুঁথি ও ইট-কাঠের চূর্ণ-বিচূর্ণ উপাদান-সমষ্টি নাড়ানো, সে বড় সহজ কথা নয়। বহু অর্থ এবং বহু সময় ব্যয় হইবে! মস্ত গোলযোগ বাধিয়া দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে···যে শৃঙ্খলা জাগাইয়া তোলা গিয়াছে, সেটা একেবারে ওলোট পালোট হইয়া যাইবে! সে বড় সহজ বিপদ নয়। তার চেয়ে—

ওধারে এ কি—অমিয় যে সুর ফিরাইয়া দিল, বাঃ, বেশ গাহিতেছে তো! অমিয় তখন গাহিতেছিল,—

হেলাফেলা সারা বেলা এ কি খেলা আপন-মনে!

এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে!

কিন্তু না, না। শচীন অশোকের লুপ্ত কীর্ত্তি উদ্ধার করিয়া তুলিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুত, সাহিত্য-পরিষদে সে মস্ত একটা প্রবন্ধ শীঘ্রই পড়িবে বলিয়াছে—সে-সব ভুলিয়া গানের সুরের ফানুসে ওড়া, এ তার চলিবে না!

সে অস্থিরভাবে অমিয়র ঘরে আসিল; ডাকিল,—অমিয়—

অমিয় গান থামাইয়া বলিল,—কেন?

শচীন বলিল,—তোমার কি উচিত আমার কর্ত্তব্যে বাধা দেওয়া?

অমিয় বলিল,—তোমার কর্ত্তব্যে বাধা দিয়েচি! আমি?

শচীন বলিল,—হাঁ।

একটু বিস্ময়ের ভাবে অমিয় বলিল,—কি করে?

শচীন বলিল,—তুমি জানো, এই ঘরে বসে আমি দেশের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করি?

—জানি।

—আর এই আমার মন যখন তার মধ্যে ধ্যানমগ্ন, তখন তোমার এই স্বরের অত্যাচার···

অমিয় বলিল,—কিন্তু আমি নতুন শিখ্‌চি কি না—কাজেই···

শচীন বলিল,—প্রত্নতত্ত্ব আমার ধ্যান-জ্ঞান সব, আমার ইজ্জত, মান এখন। এর মধ্যে···

অমিয় বলিল,—কিন্তু আমারো এখন জীবনের লক্ষ্য এই স্বরের সাধনা করা!

—সেটা যদি অন্য ঘরে করো···

—এত বড় হার্ম্মোনিয়ম আর কোন্ ঘরে রাখবো? নাড়া-চাড়াতে বাজনার টিউন খারাপ হয়ে যাবে। তুমি তো জানো, হারল্ড কোম্পানি দেখে শুনে এই ঘরের এই জায়গাটিতেই হার্ম্মোনিয়ম রেখে গেছে—নাড়তে বারণ করেছে এ তো যা-তা জিনিস নয় যে···

বাধা দিয়া শচীন বলিল,—কিন্তু আমি বল্‌চি, আমি স্বামী···

অমিয় বলিল,—আর আমি স্ত্রী···

শচীন বলিল,—বুঝেচি, এখনকার মাসিক-পত্রে এই যে নারীর সাম্য-সাম্য বলে একদল লোক চীৎকার সুরু করেচে, এ তার ফল!

অমিয় বলিল,—তার মানে?

শচীন বলিল,—তুমিও যে এই স্বামীর সঙ্গে সমানে টক্কর দিতে চলেচো···

অমিয় বলিল,—তুমিই তো বলো, স্বামীও মানুষ, স্ত্রীও মানুষ, স্বামীরও মন আছে, সখ আছে, স্ত্রীরও ঠিক তাই।

শচীন একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল,— হুঁ।

অমিয় আবার হার্ম্মোনিয়মে সুর দিল।

শচীন বলিল,—আগেই ঠিক ব্যবস্থা ছিল, নারী আর পুরুষ এক হ'তে পারে না। স্ত্রী স্বামীর অধীন হবে, সমানে তার সঙ্গে টক্কর দেবে না—কারণ স্ত্রী মেয়ে মানুষ, আর স্বামী পুরুষ।

অমিয় উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল,—স্বামীর খিদে পেলে আহার চাই, হাওয়ায় মেটে না—স্ত্রীরও তাই! তবু স্ত্রী হবে শুধু অধম বাঁদী, আর স্বামী তার মনের পানে ফিরেও চাইবে না?

শচীন বলিল,—তর্কের কথা নয়,—এতে তর্ক চলে না। তর্ক চলে সমাজে, সভায়, মাসিক-পত্রে। ঘরে-সংসারে স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে তর্ক করবে না, স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করবে।

রুদ্ধ অভিমানের সঙ্গে একটু রাগের ঝাঁজ মিশাইয়া অমিয় বলিল,—এতদূর! বেশ! বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল; তারপর দ্রুত সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিল, শচীন তার হাত ধরিয়া বলিল,—কোথা যাচ্ছো?

অমিয় বলিল,—ছাড়ো। আমার যেখানে খুশী যাই না কেন! তোমার কি?

অমিয় চলিয়া গেল। শচীন স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, অমিয়র মনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তার কাজে আর অমিয়র সে সহানুভূতির সুর তেমন করিয়া বাজে না! সে হাসি নাই, অমিয় এখন গম্ভীর হইয়াছে! খুব দরকারী কথা ছাড়া দু'জনের এখন চুপ করিয়াই দিন চলিয়া যায়। যে-অমিয় শচীনের পড়ার

ঐ নীরস বই হইতে কত কথা জানিতে চাহিত, জানিতে কি আগ্রহ দেখাইত—সেই অমিয় তার পুঁথি নুড়ি ও পাথরের পানে একবার চাহিয়াও দেখে না! বরং দু'একদিন অনুযোগ তুলিয়াছিল, শচীনের অবস্থার উল্লেখ করিয়া।...কিন্তু সে কি করিয়াছে? সে একটা কীর্ত্তির পথে চলিয়াছে! স্ত্রীর সহিত অলস ছেলেখেলায় নষ্ট হইবার জন্য এ জীবনটার সৃষ্টি হয় নাই! এই সহজ কথাটা অমিয় যদি না বোঝে তো উপায় কি?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শচীন নিজের ঘরে গেল এবং একখানি পুঁথি খুলিয়া বসিল। পুঁথির পাতাটাকে খুলিয়া ধরিতে বাঁশের ঘুণের মতই তার খানিকটা গুঁড়া হইয়া ঝরিয়া পড়িল। শচীন দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিশ্বাস ফেলিল,—হায় রে, তার কত-বড় আশায় বাজ পড়িয়া গেল!

হঠাৎ দ্বারের পাশে অমিয় আসিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুটো তার ফুলিয়া উঠিয়াছে। শচীনের পায়ের কাছে ভাঁজ-করা একটা চিঠি ফেলিয়া দিয়া সে তখনই অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুক্ষণ পরে শচীনের হুঁশ্ হইল। চিঠিখানা সে খুলিয়া পড়িল। চিঠিতে লেখা আছে—

> আমার সুখ-দুঃখ যদি তোমার মনের কোণে ঠাঁই বা আশ্রয় না পায়, তো মিথ্যা কেন তোমার যশের পথে কাঁটা হইয়া পড়িয়া থাকি? এ কাঁটা আজ তুলিয়া সরাইলাম। তুমি নিশ্চিন্ত নিষ্কণ্টক হও।
>
> অমিয়।

লেখা ছত্রগুলার উপর দিয়া সে চোখ বুলাইয়া গেল মাত্র, মনে সেগুলা এতটুকু দাগ টানিল না; কারণ মন তখন চূর্ণ-বিচূর্ণ পুঁথির পাতায় একেবারে তন্ময়!

হঠাৎ দাসী আসিয়া হম্প-দম্প ভাবে বলিল,—বৌদিদি কোথায় দাদাবাবু?

তার ভাব দেখিয়া ভড়্কাইয়া শচীন তড়াক্ করিয়া লাফ দিয়া উঠিল, বলিল,—কেন রে?

দাসী বলিল,—আমি বাসন মাজছিনু, আমার কাছে এই চাবির রিংটা ঝপাৎ করে ফেলে দিয়ে বৌদি বললে,—তোর বাবুকে দিগে যা। আমি হক্‌চকিয়ে গেলুম, বল্লুম, কেন গো? তা বৌদি বললে,—আমি মরতে যাচ্ছি। তা আমি কি ছাই অত বুঝি! তার পর বাসন মেজে মুছেটুছে রেখে-ঢেকে ভাবলুম, বৌদি কোথায়, দেখি তো! বৌদিকে তো গোটা বাড়ীটার কোথাও দেখ্‌চি না।

—বলিস্ কি? বলিয়া শচীন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল। এ-ঘর, ও-ঘর, ছাদ, কোথাও নাই! শচীন তখন সে চিঠিখানা খুলিয়া মন দিয়া পড়িল। ইস্, চিঠিতে সে যে বিদায় লইয়াছে! আর শচীন তা পড়িয়া দেখে নাই!

হঠাৎ নীচে হইতে ঝি চীৎকার করিল,—দাদাবাবু ঝট্ করে এই খানটেয় এস্‌ন গো—এই ছ্যানের ঘরে।

শচীন এক মুহূর্ত্তে সেখানে গেল—গিয়া দেখে, প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার জলে এ কি! শাড়ী-পরা···? এ যে অমিয়!

কম্পিত দুই হাতে তুলিয়া সে দেখে, অমিয়র শাড়ী-পরানো একটা পাশ-বালিশ! তবে···

ফিরিতেই হাসির ঝাপ্‌টায় তার ধাৎ ফিরিয়া আসিল। অমিয় একখানি গেরুয়া রঙের শাড়ী পরিয়া শচীনের পায়ের কাছে টিপ করিয়া প্রণাম করিল; বলিল,—না, মলুম না, আত্মহত্যা পাপ। তবে যখন তোমার আদর হারিয়েছি, তখন আমার এ জীবন দেশের

কাজে ঢেলে দি। আমি যাই, বিদায় দাও, আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যাচ্ছি।

—ছি অমিয়—বলিয়া শচীন অমিয়কে তুলিয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইল; প্রায় কাঁদো-কাঁদো গলায় বলিল,—কেন মিছে অভিমান করো, অমিয়? এই যে যশের পথে চলেছি, এ-চলার প্রধান সুখ কি, জানো? যে-তুমি ঐ জানলাটিতে বসে আমার সে-চলা সোহাগ-ভরা দৃষ্টিতে দেখ্‌চো! ভুল বুঝো না অমি—

অমিয় বলিল,—তোমার কর্ত্তব্যে খালি বাধা দিচ্ছি বৈ তো না!

শচীন বলিল,—তাই যদি সত্যি ভেবে থাকো তো বেশ, আমি ও নুড়ি-পাথর ত্যাগ করচি।

অমিয় বলিল,—তা কেন? তবে ওর মধ্যে আমায় ডাকো না কেন—সেই তো আমার দুঃখ! আমি তো প্রমোদকুঞ্জেই তোমার সঙ্গিনী হয়ে থাকতে চাই না, তোমার সব-কাজেই যে আমারো হাত লাগাতে চাই!

শচীন বলিল,—বেশ, তাই হবে···এখন এ-বেশে কিন্তু তোমায় ভারি মানিয়েচে!

অমিয় বলিল,—দেখো, আবার চিত্র-শিল্পী হয়ে বসো না যেন।

শচীন বলিল,—তাই হবো, তার প্রথম ধাপ এই অধর-যুগলে চুম্বন-রেখা অঙ্কন করা!

অমিয় বলিল,—আঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, দেখচো আমি সন্ন্যাসিনী!

শচীন বলিল,—সন্ন্যাসিনীর ব্রত ভঙ্গ হলো। বলিয়া শচীন আবার অমিয়র অধরে চুম্বন করিল।

অমিয় বলিল,—আঃ, কি করো ! ঝি ওদিকে রয়েছে যে !

শচীনের চোখের সম্মুখে যে বহির্জ্জগৎ আবার সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, সেটা যেন এতক্ষণ কোথায় উবিয়া গিয়াছিল ! বাহিরে দাসী গজ্ গজ করিতেছিল,—বাবা, বাবা, কত রঙ্গই জানো ! কি দৌড়টাই দৌড় করালে ! মাগো !

জীবনের বসন্ত

বালিগঞ্জে বিমল-দেবীর বাড়ী ভারী সমারোহের পার্টি ছিল। মিউজিক স্কুলের ছাত্রীরা গান-বাজনা আর অভিনয়ে আসর জমাইয়া তুলিয়াছিল খুব, কাজেই পার্টি ভাঙ্গিতে রাত এগারোটা বাজিল।

অমলা সেই পার্টিতে গিয়াছিল; পার্টি ভাঙ্গিলে মোটরে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়া একেবারে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। ছেলে-মেয়েরা খাটে শুইয়া ঘুমাইতেছে। অমলা একবার চকিতের জন্য ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল, ছোট খোকার ঘুমন্ত মুখে একটা চুমু খাইল, তারপর পাশের ঘরে চলিয়া গেল, বেশভূষা ত্যাগ করিবার জন্য।

খোকার ঝি আসিয়া দাঁড়াইলে অমলা প্রশ্ন করিল,—ছেলেমেয়েরা খেয়ে-দেয়ে শুয়েচে তো?

খোকার ঝি কহিল,—হ্যাঁ।

—ঘুম ভাঙেনি কারো?···আমায় খোঁজেনি?

—না।

—বাবু কখন এলেন রে?

—বাবু তো এই-মাত্তর ওপরে এলেন, এসে নিজের ঘরে গেছেন।

—আমায় খুঁজেছিলেন?

—না।

—তুই যা।···ওঃ, কাপড়-চোপড়? তা, এ-সব রাত্রে এই ঘরেই থাক্। তুই শুধু আমার কাপড় আর সেমিজটা দিয়ে শু'গে যা, রাত হয়েচে অনেক।

খোকার ঝি সাড়ী-সেমিজ রাখিয়া শুইতে গেল।

অমলা প্রকাণ্ড আয়নার সামনে দাঁড়াইল। কমলা-লেবু রঙের ক্রেপ-সিল্কের শাড়ী, আর তারি ব্লাউজ, গলায় কলারের নীচে মুক্তার মালা···বসন-ভূষণগুলা তার রঙের সঙ্গে এমন মানাইয়াছিল যে, পার্টিতে মিসেস্ সেন তার রূপের কতখানি তারিফ করিলেন,···শুধু রূপ? কেমন শ্রীটুকু···অমলার ঠোঁটের কোণে গৌরবের একটা হাসি খেলিয়া গেল। আপনাকে নানাভাবে নিরীক্ষণ করিয়া শাড়ী-আঁটা ক্রচ্‌টা সে খুলিয়া ফেলিল। তারপর মুক্তার মালা, ব্রেশলেট খুলিয়া আর্শির টেবিলে রাখিয়া ব্লাউজ খুলিল। আর্শির বুকে আপনার নিরাভরণ মূর্ত্তির পানে তার নজর পড়িল। সে চমকিয়া উঠিল। এ সে-ই···! গালে ব্লুম-রুজ মাখা, গহনা আর রঙীন কাপড়-চোপড়ের আড়ালে তার সারা দেহে এই যে অপরূপ শ্রী ফুটিয়াছে, এ তার নিজের দেহের, না, মদনের-কাছ-হইতে-মাগিয়া-লওয়া সেই চিত্রাঙ্গদার রূপ-যৌবনের মতোই কৃত্রিম! আজই পার্টির ঐ অভিনয়ে সেই গানটা·· গানের ছত্র সুরমার মনে পড়িল,—

বয়স আমার এগিয়ে গেছে, যৌবনেরি সীমার পারে...
মন মানে না, সে-যৌবনে জড়াতে চায় বারে বারে!

এর পরের কথাগুলা ঠিক মনে নাই। তবে মনের সঙ্গে বয়সের এই বিরোধে নায়িকার কি বেদনাই না বাজিতেছিল! এত বড় ট্রাজেডি আর আছে, বিশেষ নারীর পক্ষে। বয়স কোনো দিকে না চাহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, মন তো তেমন করিয়া ছুটিতে পারে না! সে ঐ যৌবনের সমস্ত মাধুরীটুকুকে আপনার মাঝে প্রাণপণ শক্তিতে চাপিয়া যে ধরিয়া রাখিতে চায়! জগতের এই চলা-ফেরার পথে

লোকের পর লোক আসিতেছে···যৌবনের মন্দিরটির কাছেই সব-চেয়ে বেশী ভিড়! এ মন্দিরের দ্বার ছাড়িয়া কেহই আর নড়িতে চায় না! লক্ষ্মীছাড়া বয়সটার কিন্তু না আছে মায়া, না আছে মমতা—রস-কস বুঝিবারো তার শক্তি নাই!···অথচ মন তাকে ছাঁটিয়া ফেলিতেও পারে না!

অমলার মনে হইল, গানের সে ছত্রগুলা···যেন তারি অন্তরের কথা! তারো বয়স হইয়াছে। কিন্তু পাছে সে খপরটুকু বাহির হইয়া পড়ে, তাই প্রাণপণে বাহির হইতে এই দেহটাকে নানা সাজ-সরঞ্জামে গুছাইয়া রাখিতে সর্ব্বক্ষণ কি এ চেষ্টা! নিজেকে সাজাইয়া রাখিতে কি কারিগরিই না করিতে হয়! এর চেয়ে মর্ম্মান্তিক বেদনা নারীর আর কি আছে! কিন্তু যার জন্য বিশেষ করিয়া এ চেষ্টা,—সেই স্বামী···

তিনি তাঁর কাগজ-পত্র, আর ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়াই দিনরাত মশ্‌গুল! কি মোহিনী বেশ ধরিয়া তাঁর সামনে অমলা কতবার গিয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু তিনি কি কোনোদিন মুখের পানে চাহিয়া অমলাকে তেমন আদর বা সোহাগ করিয়াছেন! জীবনে প্রথম যেদিন বসন্ত-উদয় হইল, সেদিনকার সেই অজস্র আদর, অফুরাণ অর্থহীন কত-না প্রণয়-কাকলী····· ···আজ তার কিছু নাই! সে কত দিনের কথা! হোক্ দীর্ঘ দিন, তবু আজো তেমনি আদর পাইবার জন্য অমলার মনে তেমনি আকুলতাই তো জাগিয়া আছে······

অমলার মনে হইল, এই কৃত্রিম সাজ-সজ্জার ফাঁক দিয়াই কি সে তবে স্বামীকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে?···

কথায় বলে, নারী কুড়ি পার হইলেই যৌবন-সীমার বাহিরে চলিয়া যায়! এ-কথা সে কোনোদিন মানে নাই! তার বয়স হইয়াছে

ত্রিশ, চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, তাদের পরিচর্য্যা করিতেই সময় কাটিয়া যায়! সব সত্য···কিন্তু স্বামীর কাছে সে যে তাঁর সেই অমলাই আছে! একটু প্রণয়-সুধার পিয়াসী, একটু আদরের কাঙাল!

টেবিলের উপর তোয়ালেখানা পড়িয়াছিল। অমলা তোয়ালে ঘষিয়া মুখের রং মুছিয়া ফেলিল।

রাত বারোটা বাজে। পাশের ঘরে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে! ছেলে-মেয়েদের লইয়া সে এই ঘরেই শোয়। স্বামীর শয্যা··তার ও-পাশের ঘরে! সেই যে কবে দু'জনে দু'ঘর লইয়া আলাদা হইয়াছে, সে-অবধি এই ব্যবধান! দু'জনে দেখা কি হয় না? হয়! অসদ্ভাব নাই, বিমুখতা নাই, কাজের কত কথা, সাংসারিক বিষয় লইয়া অতি-তুচ্ছ পরামর্শটুকুও···! সব ঠিক আছে! সমস্ত ব্যাপারই অমলা যা করে, তা'ই হয়, স্বামীর দিক হইতে এতটুকু অনুযোগের সুরও ওঠে না! দৈবাৎ কোনোটায় স্বামী যদি বলেন, তাইতো···অমলা অমনি জবাব দেয়, তা···তোমার মত না থাকে যদি,···স্বামী অমনি তার কথায় বাধা দিয়া হাসিয়া বলেন,—না, না, তোমার ব্যবস্থাই ঠিক! তাতে আমার অমত নেই মোটে!···

সংসারে সুখ যাকে বলে, তার অভাব নাই! সাম্‌নে-আড়ালে পাড়ার মেয়েরা অমলার সৌভাগ্যের কত কাহিনীই গাহিয়া বেড়ায়!··· তবে···?

আজ অভিনয়ে ঐ গানটা শুনিয়া অবধি···আর শুধু তাই নয়। তার উপর, এই আয়নার সামনে দাঁড়াইতেই হঠাৎ অমলার বুকটা কেমন হাহাকার করিয়া উঠিল! নারী কি এইটুকুই চায়? এই আধিপত্য পাইলেই কি তার সব পাওয়া হইল?···সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

বাহিরে চাঁদের জ্যোৎস্নায় আলোর পাথার বহিয়া চলিয়াছে। ফাল্গুন মাস। স্নিগ্ধ বাতাসে সারা পৃথিবী যেন উল্লাসে আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে! অদূরে কোন্ গৃহের কোণে বসিয়া এই চাঁদের আলোয় বিশ্ব ভুলিয়া কে গাহিতেছিল—

সখি, সে গেল কোথায়!
তারে ডেকে নিয়ে আয়!
দাঁড়াবো ঘিরে তারে তরুতলায়!

পাথরের পুতুলের মত নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া অমলা সে-গান শুনিল। গান থামিলে তার চেতনা হইল। নির্লজ্জ সাজ, নির্লজ্জ সে···তাই এখনো সে-সাজ গায়ে রাখিয়াছে! এ-সাজে কি সে লাভ করিল! শুধু সাজের দিকেই মন ঢালিয়া মূঢ়ের মত কিসের গৌরব-স্বপ্নে সে এমন অচেতন ছিল। এ-সাজের পানে কে চাহিয়া দেখিয়াছে! যার দৃষ্টির লোভে এ-সাজে প্রথম নিজেকে সাজাইবার আকুলতা প্রাণে জাগিল, যৌবনের বিদায় লওয়ার মত খপর এই সাজের জমকে যার কাছে সে পৌঁছিতে দিতে চায় নাই, সাজের আড়ম্বরের ঘটায় তার কথাই যে সে ভুলিয়া বসিয়া আছে!

আজ বসন্তের এই উচ্ছ্বাসে-নিশ্বাসে সাজের খোলস্ কোথায় সরিয়া গিয়াছে! মনের ভিতরকার প্রচণ্ড দৈন্য-হাহাকার এক নিমেষে সেই সাজের ফাঁকি ছিঁড়িয়া চোখে ধরা পড়িয়াছে!

স্বামী···! তাঁর কাছে যাইতে বড় সাধ হয়! তিনি যদি একবার মুখের পানে চাহিয়া দেখেন, আগেকার মত তেমনি দৃষ্টিতে চাহিয়া একবার একটু আদর করেন!···

কিন্তু এই রাত্রে কি বলিয়া হঠাৎ স্বামীর কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? আদর ভিক্ষা চাহিতে···সোহাগের কাঙালিনী?···ছি! এর চেয়ে

লজ্জা আর নাই! কাঁদিয়া আদর মাগিবে স্বামীর কাছে? তার চেয়ে…!

হঠাৎ একটা কথা মনে হইল। গহনাপত্র যে-আলমারিতে থাকে, সে-আলমারিটা স্বামীর ঘরে। রাত্রে কোথাও গেলে ফিরিয়া গহনাগুলা অমলা নিজের ঘরে আর্শির টেবিলের ড্রয়ারে রাখে, পরদিন সকালে সেগুলা আলমারিতে তোলে! গহনা তোলার অছিলা কাজেই চলে না! তবে…? ঠিক!·· কিন্তু ছলা! উপায় নাই! নারীকে সে-আশ্রয় লইতেই হইবে···না হইলে···

মুক্তার কলারটা ফাঁশ দিয়া জড়াইয়া গলায় আঁটিয়া শাড়ীর আঁচল কোনোমতে গায়ে জড়াইয়া অমলা গিয়া স্বামীর ঘরের দ্বারে দাঁড়াইল।

ঘরে জ্যোৎস্না একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তা-সত্ত্বেও ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলিতেছে, আর সে-আলোয় বিছানায় শুইয়া স্বামী কি-একখানা বই পড়িতেছিলেন। অমলা একটা নিশ্বাস ফেলিল। ঐ নীরস বইয়ের পাতায় এত কি সুধার স্বাদ পাইয়াছ গো, তুমি!

বহিখানা উপন্যাস। নায়ক-নায়িকার খুব একটা ঘোরালো রকমের প্রণয়-সমস্যার মাঝখানে পড়িয়া স্বামীর বুকটা নিমেষের জন্ম কেমন ধ্বক্ করিয়া উঠিল! কবেকার কোন্ অতীতের ভুলিয়া-যাওয়া স্মৃতির রাশ বুকের মধ্যে ঝড় তুলিল। বহিখানা বুকের উপর রাখিয়া স্বামী আকাশের পানে চাহিলেন। আকাশে তুষার-শুভ্র আলোর হিল্লোল! তার উপর একরাশ ফোটা ফুলের গন্ধ বহিয়া ফাগুন-বাতাস দুরন্ত শিশুর মত ঘরের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছিল।

অমলা নিমেষের জন্ম দাঁড়াইয়া স্বামীর পানে চাহিয়া রহিল। বুক

তার তুলিয়া উঠিল। তার পর কখন্ এক সময় ডাকিল,—ওগো···
বলিয়াই সে একেবারে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইল।

স্বামী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, চাঁদের আলোয় অমলাকে কি অপরূপ যে দেখাইতেছিল!

এত রাত্রে অমলা! স্বামী ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিলেন, কহিলেন,—কি বলচো? ছেলেদের কারো অসুখ হলো না কি?

অমলা কহিল,—না।

আঃ! স্বামী আরামের নিশ্বাস ফেলিলেন। অমলার বুকে কে যেন পাথর ছুঁড়িয়া মারিল। শুধু কাজ—কাজের কথা ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর আর কথা নাই? হায় রে!

স্বামী কহিলেন,—তুমি ঘুমোও নি যে এখনো?

অমলা আবার নিশ্বাস ফেলিল। সে কহিল,—না, বালিগঞ্জে বিমলাদিদির ওখানে নেমন্তন্ন ছিল না? মিউজিক-স্কুলের মেয়েরা অভিনয় করলে,—দেখে ফিরচি এই।

স্বামী কহিলেন,—ওঃ!

ছোট্ট একটু স্বর! কিন্তু সে-স্বরে যেন একরাশ তীক্ষ্ণ তীব গাঁথা ছিল! তার সব কয়টা আসিয়া অমলার বুকে বিঁধিল। এতদূরে গিয়া পড়িয়াছে সে·· অমলা কখন্ কোথায় যায়, ফিরিল কি না, স্বামী তার খপরও রাখেন না! সে-খপর রাখার প্রয়োজনও মনে করেন না! তার মুখে কোনো কথা ফুটিল না।

স্বামী কহিলেন,—তবে···?

অমলা বেদনাহত মনটাকে নাড়া দিয়া কহিল,—তবে আবার কি··! আসতে কি নেই?

স্বামী কহিলেন—না, তা থাকবে না কেন? তবে আসো না

কি না, তাই বলচি···তার পর আর কি বলিবেন, স্বামী ভাবিয়া পাইলেন না। হঠাৎ তার মনে হইল, তাইতো, অমলা দাঁড়াইয়া আছে! তিনি বলিলেন,—তা বসো, অমল—

অমল! সেই ডাক! এ ডাক সে কতদিন শোনে নাই! এ-জীবনে কখনো শুনিয়াছিল—না, সে স্বপ্নের কথা? ওগো, হঁ্যাগো—এমনি ডাকেই যে ঘরকর্ণার সব কথা চুকিয়া শেষ হইয়া যায়!

অমলা বলিল,—এমনি বসতে আসিনি। কলারটা খুলতে পারচি না, তাই···যদি দেখে খুলে দাও···

—দিচ্ছি! বলিয়া স্বামী বসিলেন। অমলাকে এক-রকম বুকের উপর টানিয়া স্বামী কলারের ফাঁশটায় হাত দিলেন। আবেশে অমলা দুই চক্ষু মুদিল।

বহুক্ষণ নাড়াচাড়া টানাটানি করিয়াও ফাঁশ খুলিতে না পারিয়া স্বামী কহিলেন,—হলো কি! এ যে খোলা যাচ্ছে না—

অমলা কহিল,—ছাড়ো, নিজে দেখি আর একবার।

স্বামীর বেশ লাগিতেছিল—এই স্পর্শটুকু! বুকের উপর অমলা এই যে ঢলিয়া পড়িয়াছে···খোঁপার নীচে সেমিজের লেশের উপর আলোর রেখার মত তার ঘাড়ের যেটুকু দেখা যাইতেছে, এই যে রঙের উচ্ছ্বাস-আভাটুকু···

অমলা কহিল,—ঠিক ফাঁশটায় নজর করে ছাখো দিকিন্···

স্বামী আরো মুখ নামাইলেন। মন মুহূর্ত্তের জন্য মাতাল হইয়া উঠিল। আবেশে চেতনা হারাইয়া অমলার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া স্বামী তার গ্রীবায় চুম্বন করিলেন। অমলার সর্ব্ব-শরীর কাঁপিয়া-দুলিয়া উঠিল।

স্বামী কহিলেন,—তুমি একজন রূপসী, সত্যিই ··

অমলা কহিল,—সত্যি বলচো ?

স্বামী কহিলেন,—সত্যি কথাই, অমল। মনে নেই, একদিন তোমার এই কেশের রাশি, তোমার এই পাৎলা গোলাপী ঠোঁট, তোমার ঐ চোখদুটি···এদের উপর কত কবিতা লিখেচি যে! তোমায় বল্‌তুম না যে, তোমার রূপের গর্ব্ব আমার মনে কতখানি! এত রূপ কোথাও সত্য দেখিনি। এখনো বয়স হয়েচে তো···তবু এ রূপ দেখলে বিহ্বল হতে হয়!

অমলার সমস্ত চেতনা যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। সে কহিল,—কি বলচো, তুমি, এঁ্যা!

স্বামী একটু অপ্রতিভ হইলেন; হাসিয়া বলিলেন,—বয়স হয়েচে এখন···কথাটা বেমানান হলো···না ?

অমলার মন ক্ষোভে-দুঃখে কাঁদিয়া উঠিল, না, না, না! কিসের বেমানান্! ও আদরের কথাগুলা মন কি বিহ্বল হইয়াই গ্রহণ করিয়াছে!···মুখে সে কিছু বলিতে পারিল না। স্বামীর সঙ্গে নূতন করিয়া আজ যেন আবার আলাপ-পরিচয় করিতে হইবে! সেই ফুলশয্যার রাত্রির মত······মনের কথাগুলা হুবহু বলিয়া গেলে এখন যেন কেমন-ধারা শুনাইবে! অমলা চুপ করিয়া রহিল। লজ্জায় কুণ্ঠিত হইলেও কি যেন পাইবার আশায় মন তার দুলিতেছিল।

কারো মুখে কোনো কথা নাই!

দূরে তখনো গান চলিয়াছে···আর-একটা। এবার সে গাহিতেছিল—

কেন ধরে রাখা সে যে যাবে চলে
মিলন-যামিনী গত হলে।

অমলা ভাবিল, কে ও ? লোকটিকে হঠাৎ আজ এমন-সব গানে

পাইয়া বসিল কেন? না, না, মিলন-যামিনী গত হইবে না, গত হইবার নয়!

স্বামী হাত বাড়াইয়া অমলার হাতখানি ধরিলেন, ডাকিলেন,—অমল···

অমলা বলিল,—কেন?

তাইতো, কি বলা যায়? স্বামী ভাবনায় পড়িলেন, অথচ বলিবার কত কথা বুকের মধ্যে মর্ম্মরিয়া উঠিতেছে!

অমলা বলিল,—বাঃ! আমার কলারটা খুব খুলে দিলে তো!

অমলাকে বুকের মধ্যে টানিয়া স্বামী আবার তার মুক্তার কলার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা স্প্রীং ভাঙ্গিয়া গেল; কলার খুলিল।

অমলা কহিল,—যাঃ, ভেঙ্গে ফেললে?

স্বামী কহিলেন,—তাতে কি! সারতে দিয়ো কাল।

অমলা কলারটা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল। স্বামী তেমনি বিহ্বল দৃষ্টিতে অমলার পানে চাহিয়া থাকিয়া তাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন; কহিলেন,—ভাঙ্গা গহনা জোড়া লাগে, কিন্তু আমাদের প্রাণ দুটো না ভেঙ্গেই যে ছেড়ে আছে—এ কি জোড়া লাগে না?

অমলা স্বামীর পানে চাহিয়া ছিল। জানলা দিয়া চাঁদের যত আলো আসিয়া অমলার মুখের উপর পড়িয়াছিল। মুখে কি শোভাই না ফুটিয়াছিল! স্বামী সে শোভা দেখিতে লাগিলেন—তন্ময় হইয়া।

অমলা বলিল,—সেইজন্যেই এসেচি তো। আর দূরে রেখো না গো। আজ বুঝেচি, সংসার আছে, সেই সঙ্গে তুমিও আছ, ঠিক···কিন্তু আমিও আছি, আমাদের মন-দুটোও আছে।

স্বামী অমলার পানে চাহিয়া রহিলেন। অমলা সহসা দুই হাতে স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁর মুখে চুম্বন করিয়া কহিল,—আজ আমায় তোমার পায়ের কাছটিতে পড়ে থাকতে দাও। দুজনে দুজনকে এতদিন যে অবহেলা করে এসেচি, আর তা হবে না। এ অবহেলা আমি সহ্য করবো না! বলিতে বলিতে সে ঝাঁজিয়া উঠিল, কহিল,—কেন সহ্য করবো?...কখনো না! আমি স্ত্রী...স্বামীর কাছে স্ত্রী কি চিরদিন এ আদর প্রত্যাশা করবে না?

স্বামী কহিলেন,—নিশ্চয়!......সত্যি অমল, হঠাৎ একদিন যেন প্রাণের তার দুটো ছিঁড়ে গেল! মনে হলো, আমাদের প্রাণের দেনা-পাওনা সব চুকে গেছে।......মনে আঘাত বেজে আছে, প্রচুর... কিন্তু উপায় কি! যে-দীপ তার জ্বলা শেষ করে দেছে, তার কাছে আলোর প্রত্যাশাও যে নেই আর!

অমলা কহিল,—কে বললে দীপের জ্বলা শেষ হয়ে গেছে? হয়নি। অনন্তকাল ধরে জ্বলবার শক্তি রাখে এ মনের দীপ!......বয়স হয়েচে? কিসের বয়স! মন আজও তেমনি আছে, তেমনি কাঁচা, তেমনি তাজা...সেই পনেরো বছর আগে যেমন ছিল! বয়স হলেই মনকে পিষে থেঁতো করে ফেলে বুঝি?...না, আমি শুনবো না...দূরে আর থাকবো না। আমি তোমার কাছে আসবো, নিত্য আসবো...আর এমনি করেই তোমায় আদর করতে হবে! দূরে সরিয়ে দিলে চলবে না!... বলো, সরাবে না? আজো তোমার আদরের তেমনি কাঙাল যে গো আমি......

স্বামী হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—কলারের ফাঁশ খোলা তাহলে ছুতো......?

অমলা ঘাড় নাড়িয়া আবার ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—হ্যাঁ, ছুতোই।

ছুতো···তা কি হবে ? কেন তুমি আমায় ডাকোনি এতদিন তোমার কাছে ?······ঐ নীরস বইখানা তোমায় বেশী আনন্দ দিতে পারে আমার চেয়ে ?

স্বামী কহিলেন,—না, না। কিন্তু তোমারো দোষ, অমল ! আরো আগে কেন তুমি আসোনি আমার কাছে। অনেক জ্যোৎস্নারাত্রে এমন হয়েচে, মন যেন কিসের জন্তে আকুল, কি পাবার জন্ত অধীর !··· এই সব বই-কাগজ নিয়ে তার অভাব পূরণ করতে গেছি !···অথচ রাজ্যের আরাম নিয়ে তুমি আছ, আমার এত কাছে !

অমলা কহিল,—আজ এই চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধে-ভরা ঐ বাতাস···ভাগ্যে এদের পানে নজর পড়লো···তাইতো বুঝলুম···

স্বামী কহিলেন,—কি বুঝলে, অমল ?

অমলা কহিল,—যে, জীবনের বসন্ত ফুরোয় না, ফুরোবার নয়। শরীরের বয়স থাকতে পারে, মনের বয়স নেই, মন চির-যৌবন !

দূরের লোকটি আর-একটা গান ধরিয়াছিল,—

কথা নয়, কথা নয়, নয় কলরব গো,
অধরে অধর, প্রাণে প্রাণ অনুভব গো !......

স্বামী কহিলেন,—শুনচো ?······এ যেন আকাশ-বাণী······বেছে বেছে কি গানই গাইচে !······

অমলা স্বামীর পানে চাহিয়াছিল,······বিহ্বল দৃষ্টি দুই চোখে ভরিয়া ! স্বামী তার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কহিলেন,—ওরই কথা শিরোধার্য্য করি, এসো। কথা নয়, কথা নয়······শুধু প্রাণ দিয়ে প্রাণ-অনুভব···

বাহিরে চাঁদের আলোয় ফাগুন-হাওয়ার মত্ত উচ্ছ্বাস সমানে চলিয়াছে। একটা পাখীও সে আলোর বানে প্রাণটাকে ভাসাইয়া দিয়া গাহিয়া উঠিয়াছে,—পি-য়···পি-য়···পি-য়···

তেরস্পর্শ

অন্নদা, আশু আর মাখন,—বড়দিনের ছুটিতে তিনজনে কলিকাতায় আসিয়াছিল আমোদ করিতে। সহর কলিকাতা,—তায় সেবার কলিকাতায় ভারী ধুম—ইডন্ গার্ডেনে এক্‌জিবিশন, তার উপর বায়োস্কোপ, থিয়েটার! তিনজনেই চাকরি করে কৃষ্ণনগরের কালেক্টরিতে। অন্নদা বয়সে কিছু প্রবীণ,—আশু আর মাখনের বয়স কম—খেয়ালও তাই একটু উচক্কা রকমের। সখ খুব, তবে পয়সা কম, তাই—নহিলে দু'জনে কি যে করিত, সে কল্পনার কাহিনী কালেক্টরীর কেরাণী-মহলে কাহারও অবিদিত ছিল না। আগেরবারে পূজার বন্ধে আশু আর মাখন কলিকাতায় আসিয়াছিল, নগদ সাতাশি টাকা পকেটে করিয়া। দু'দিনে সব টাকা ফুকিয়া দেয়, শেষে বারো টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া তারা দেশে ফেরে; ফিরিয়া কাতর হইয়া পড়ে। অন্নদা তখন ধমক দিয়া বলে,—দু'টি গাধা! এত মেহনতের পয়সা জলাঞ্জলি দিয়ে এলি রে! তোরা কি! এবারে অন্নদাও কলিকাতায় আসিল; তাই অন্নদার হাতে টাকা-কড়ি সমর্পণ করিয়া আশু আর মাখন হুঁশিয়ার হইয়াছে, বাজে খরচটা যতখানি বাঁচানো যায়।

তিনজনে আসিয়া বাসা লইল, শেয়ালদার কাছে প্যারাডাইস্ বোর্ডিংয়ে। বোর্ডিংটি মির্জাপুর ষ্ট্রীটের অন্তর্গত এক গলির মধ্যে। গলিটি এমন যে, রৌদ্র বেচারা দিনের মধ্যে কোনোমতে এক ঘণ্টা তথায় হাজিরা দিয়া চাকরি বজায় রাখে! গলির মধ্যে একটা ডাষ্ট বিন, আর তার ঠিক সামনে প্যারাডাইস্ বোর্ডিংয়ের প্রবেশ-দ্বার। বোর্ডিংটি

আদর্শ হিন্দুমতে পরিচালিত। আদর্শ হিন্দু বলিবার কারণ,—মাছ, মাংসর ব্যবহার এখানে খুব সঙ্কীর্ণ এবং শয়নের ঘর হইতে আসন ও ও ভোজন-পাত্র অবধি বিশুদ্ধ সত্বগুণাশ্রিত,—সে-সবে তামসিকতার চিহ্নমাত্র নাই! বোর্ডিংটি মনোনীত করিবার কারণ, মাখনের এক বাল্যবন্ধু রজনী এই বোর্ডিংয়ে থাকিয়া কলিকাতায় মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করিতেছে, তাই ··

আশু ও মাখন যে পান-ভোজনে হিন্দু আদর্শ মানিয়া চলে, এ কথা বলিলে তাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। অর্থ-বল নাই·· তবু উহারই মধ্যে একটু নেশা এবং তার আনুষঙ্গিক দুই এক প্রকার আনন্দ-বিলাস, এটা সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিলে, আশু-মাখন দুজনেই ঘর-সংসারের কেয়ার খুব থোড়াই রাখে। দু' পাঁচ দিনের ছুটী পাইলে মন এই সহরের দিকে ছুটিতে চায়, কিন্তু অসচ্ছলতাই হইয়াছে কাল!

পূজার বন্ধে এই আমোদ-স্পৃহা একটু প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এমনও তো দেখা যায়, সৌখীন দলের কেহ-কেহ সখ মিটিলে খরচের হিসাব খতাইয়া একটু কাতর হয়। এরা দুজনে ছিল সে-দলের। না হইয়াই বা করে কি! জীবন-পথের পাশে আবর্জ্জনা-স্তূপের মত ঐ যে সংসারটা পড়িয়া আছে, সে সংসার নিতান্ত অকরুণ, নেহাৎ হতভাগা —তার অভাব-অভিযোগ লইয়া সে এমন কলরব-কোলাহল তোলে যে তার জ্বালায় কোন সৌখীন ব্যক্তির পক্ষে সখের মায়া রক্ষা করা দায় হইয়া ওঠে!

অন্নদা যে নিছক আমোদ করিতেই সহরে আসিয়াছে, তা নয়! তার ঘাড়ে-পড়া মা-মরা দৌহিত্রীটির বয়স হইয়াছে দশ বছর। একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল; চেৎলায় থাকে। সেটিকে দেখিয়া

ছুটো কথা পাড়িয়া সুলভে যদি তাকে আয়ত্ত করা যায়, এই ভরসায় তার সহরে আসা। বাজে খরচ সম্বন্ধে চিরদিনই সে সতর্ক। তবে বয়স-কালে হিন্দুমতে যে-সব বস্তুকে অনাচার বলে, সে-দিকে মোটে ঘেঁস দেয় নাই, এ কথা বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অর্থাৎ সে চতুর,—আমোদের দিকে নিজের পয়সা কোনোদিন সে ব্যয় করে নাই। কিন্তু এ-সব কথা থাক্—আমাদের বক্তব্য ঠিক এই ব্যাপারটি নয় তো!

আশু আর মাখন সে-দিন রজনীর সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখিতে গিয়াছিল। ছবির বিষয় ছিল, 'মাতালের অধঃপতন'। এক বিলাতী যুবা হোটেলে গিয়া দিব্য সুরাপান করিতেছে, সুন্দরী মেম সুরা বিতরণ করিতেছে, এমনি করিয়া তার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ সুরু হইল। তারপর ক্রমশঃ মদের নেশা তাকে এমন পাইয়া বসিল যে, চাকরি গেল, দেনা হইল; শেষে সে চুরি ধরিল—বিপদের পর এমনি নানা বিপদ—অর্থাৎ জটিলতার জালে আষ্টে-পৃষ্ঠে সে বাঁধা পড়িতে-পড়িতে শেষে একদিন স্ত্রীকেই খুন করিয়া বসিল, তারপর···

বিরক্ত হইয়া আশু বলিল,—ধেৎ, যত সব বাজে ব্যাপার···এলুম আমোদ করতে, না, খুনোখুনি!

মাখন বলিল,—যা বলেচো বন্ধু,···ওর বোতল খোলা দেখে আমার গলা শুড়শুড়িয়ে উঠেচে···এক গ্লাস বীয়ার মোদ্দা যদি না খেলুম, এই শীতের দিনে সহরে এসে···

আশু বলিল—উঠে পড়া যাক। কিন্তু রেস্ত···!

মাখন কহিল—একটা টাকা আছে···

আশু কহিল—অন্নদার কাছ থেকে গোটা-দশেক টাকা চেয়ে নিতে হবে···সত্যি, দু'দিন এই ভটচাযি্যি বামুনের পাল্লায় পড়ে চেৎলা

থেকে কালীঘাট ঘুরে প্রাণ গেছে···ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে এসেচি কি এই এমন বড়দিনের বাজারে···

মাখন কহিল—তাই! মোদ্দা, পয়সা চাইবার আগে কোথাও গিয়ে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে। রজনীকে বলি···

রজনী সৌখীন বন্ধু—সে সঙ্গেই ছিল। সঙ্কল্প শুনিয়া সে কহিল,—তার আর কি! আমার কাছেও টাকা-তিনেক আছে!

আশু কহিল,—বহুৎ আচ্ছা!

রাত প্রায় এগারোটা। প্যারাডাইস্ বোর্ডিংয়ে ফিরিয়া আশু দেখে, অন্নদা খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। টাকার তাগিদ সন্ধ্যাবেলা হইতেই মনে জাগিয়াছিল। সুরার নেশায় সে তাগিদ সমস্ত মনকে এমন উগ্র ঝাঁজে তাতাইয়া তুলিল যে, অন্নদাকে ধাক্কা দিয়া আশু ডাকিল,—অন্নদা-দা···

অন্নদা কহিল,—আঃ, এত রাত্রে কি জ্বালাতন করিস। যাঃ—

মাখন কহিল,—জ্বালাতন কি রকম! ওঠো, টাকা দাও···

আশু কহিল,—আমাদের টাকা···

মাখন কহিল,—হুঁ! চালাকি নয়।

আশু কহিল,—আমরা কি নাবালক যে তুমি গার্জ্জেন হয়ে আমাদের এষ্টেট্-পত্তর দেখবে?

মাখন কহিল,—না, আমরা নিজেদের টাকাকড়ির হেফাজতি করতে অক্ষম?···

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, তার সঙ্গে ধাক্কা। অন্নদা বিরক্ত হইয়া কহিল,—নেশা করে এসেছিস্ বুঝি, বাঁদররা···তোদের চীৎকারে বাসা-শুদ্ধ লোক জেগে উঠবে যে··টাকা-কড়ি কাল সকালে নিস্। এই রাত দুটোয় এসেচে হিসেব নিতে···

আশু-মাখন অপ্রতিভ। ঠিক, এত রাত্রে হিসাব লইতে আসা উচিত হয় নাই! দুজনেই শশব্যস্তে কহিল—আহা, রাগ করো না দাদা, মাপ করো—দোহাই বলচি, মাপ করো অন্নদা-দা।

নেশার খেয়াল! যে-মুখে একটু পূর্ব্বে বিরক্তির সুর ঝরিতেছিল, তিরস্কারের বচন,—সে-মুখে মিনতির ধারা আর ফুরাইতে চায় না! অন্নদা আরও বিরক্ত হইল। শীতের রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া এমন আরামের নিদ্রা যে ভোগ করিয়াছে, সেই জানে, এ ব্যাপারে বিরক্তির মাত্রা কেমন প্রবল হয়।

আশু কহিল—জ্বালাতন!

মাখন কহিল—ধেৎ তোর নিকুচি করেচে!...বলিয়া সে হাসিল। অন্নদা পাশ ফিরিয়া চক্ষু মুদিল। অন্নদার ফ্লানেলের কামিজটা আলনায় ঝুলিতেছিল, আশু গিয়া তার পকেটে হাত পুরিয়া কি-সব বাহির করিল। তারপর সেগুলা মেজেয় ফেলিয়া দুজনে দেখে, একটা আধলা, একটা বিড়ি, তামার মাদুলি একটা, ময়লা রুমালের কোণে বাঁধা চাবির তাড়া, আর একখানা কাগজ ..নোট? না...থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিল...রাম বলো!

মাখন কহিল—ঠেলে তোলো...এই জন্যেই বলে, নিজের কড়ি পরের হাতে তুলে দিয়ে সাঁতরে নদী পার হওয়া!-

আশু কহিল—সটান বল্‌লে কি না, আমরা নেশা করে এসেচি! এ-পয়সায় নেশা হয় কখনো?

মাখন কহিল—নেশাই তো করতে চাই। কিসের দুনিয়া, দাদা! বারো-মাস কি কলম পিষবো? দুদিন একটু আমোদ করবো না?

আশু কহিল—গরীব বলে কি আমাদের মন নেই, না, মনে আমাদের সাধ নেই...?

এমনি দুঃখ-বেদনা-নিবেদনের জের চলিল। ভাগ্যে সেখানে

কোনো লেখক ছিল না, কি, কোন রিপোর্টার! থাকিলে বল্‌সেভিক্‌-বাদের এ-সব ইঙ্গিত…প্রকাশ হইলে হয় তো বেচারীদের চাকরী লইয়া টানাটানি পড়িত!

দুজনে গিয়া আবার অন্নদাকে ঝাঁকানি দিল। ঔষধ খাওয়ার পূর্ব্বে বোতল ধরিয়া যে-ভাবে মানুষ তাকে ঝাঁকানি দেয়, এ ঝাঁকানি তেমনি ধরণের! অন্নদা লেপ ঠেলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া বসিল, কহিল, —ব্যাপার কি?

মাখন কহিল—আমাদের টাকা এখনি ফেলে দাও, দাদা…

আশু কহিল—সত্যি, চালাকি নয় অন্নদা-দা,—নিজেদের কাছে নিজেদের টাকা রাখবো…

অন্নদা দুজনের মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল;—তারপর কহিল,—ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে তখনই বুঝেচি, কীর্ত্তি করচো কোথাও!…

আশু-মাখন দুজনেই আবার অপ্রতিভ হইয়া এতটুকু! অন্নদা বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপ টানিয়া দিল।

পাঁচ মিনিট পরে আশু-মাখনের চেতনা ফিরিল। তাই তো… টাকা? না, অন্নদা ভারী জ্বালাতন করিল তো!

তারা তখন ঘরের জিনিষ-পত্র টানাটানি করিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া তুলিল। এখানকার বাক্স টানিয়া ওখানে রাখে,—গায়ের র‍্যাপার, ওভার কোট, একটা কম্ফর্টার…নাড়িয়া-চাড়িয়া পয়সা বাহির হইল না! তারপর…? ওই চাবির তাড়া দিয়া অন্নদার বাক্স খুলিবে? না, বাপরে, চুরি! মুস্কিল ঘটিল!

আশু কহিল—উপায়?

মাখন কহিল—আজ টাকা না পেলে আমি রক্ত-গঙ্গা হয়ে মরবো…

আশু ডাকিল—অন্নদা-দা···শুনচো···চালাকি ভালো লাগে না, বলচি। টাকা দাও···

অন্নদা উঠিল, কহিল—কিসের টাকা ?

মাখন কহিল—আমাদের দুজনের টাকা তোমার কাছে যা জমা রেখেচি···

অন্নদা কহিল—রাত দুটোর সময় টাকা দিতে হবে, এমন কড়ার ছিল ?···ভালো মাতালের পাল্লায় পড়লুম তো ! রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ রী-রী করিয়া উঠিল। সে বলিল,—ফের যদি জ্বালাতন করে ঘুম ভাঙাও, তাহলে ঘর থেকে বার করে দেবো !

আশু ভড়কাইয়া গেল। মাখন কহিল—ভালো মজার কথা তো এ···

কিন্তু উপায় কি ! দু'জনে হতভম্ব, মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল। অন্নদার নিদ্রার চেষ্টায় কতক্ষণ কাটিয়া গেল। পাশে কার বাড়ীতে একটা শিশু ট্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—পথে কে গান গাহিয়া চলিয়াছে ! নীচের উঠানে ইয়ার্ড-গলিতে জল পড়ার একটানা শব্দ··· দূরে কোথায় কুকুর, না, বিড়াল ডাকিতেছে—কি ভীষণ তীব্র সে স্বর !

আশু কহিল—কাল মজা দেখাচ্ছি···টাকা আর চাইবো না তো···

মাখন সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিল—অর্থাৎ · ?

আশু কহিল—একটা মতলব ঠাওরাচ্ছি। মাতাল ? বটে ! আচ্ছা, মাতালের বুদ্ধির বহরটা দেখো তখন···

যাকে উদ্দেশ করিয়া ভয়টা দেখানো হইল, সে তখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে !···

গভীর রাত্রি। মাখন উঠিয়া অন্নদার লেপ ফেলিয়া তার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিল। এ-ভাবে ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র উঠিয়া

বসিয়া অন্নদা কহিল—কি মনে করেচো, বলো তো…? তার স্বরে বিরক্তির ঝাঁজ!

আশু কহিল—টাকা দাও বলচি, ভালো চাও যদি…

মাখন কহিল—দাও টাকা…

অন্নদা কহিল—দেবো…বলিয়া সে উঠিয়া দু'জনের হাত ধরিয়া সজোরে নাড়া দিয়া এক কোণে তাদের ঠেলিয়া দিল। আশু-মাখন গিয়া কোণে ঢিপ করিয়া পড়িল।

অন্নদা কহিল—এবার যদি ঘুম ভাঙ্গাও তো এমন মার খাবে দু'জনে—পাজী, বেহায়া, মাতাল…

ধাক্কা খাইয়া আশু ও মাখন একেবারে চুপ করিয়া গেল; উঠিবার চেষ্টাও করিল না; কুণ্ডলী পাকাইয়া দুজনে মেঝের পড়িয়া রহিল। অন্নদা আবার লেপ মুড়ি দিয়া বিছানায় শুইল।

সকালে উঠিয়া অন্নদা দেখে, সঙ্গীদ্বয় সেই কোণে পড়িয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে! তার হাসি পাইল—হতভাগা বওয়াটে ছোকরা দুটো! একটা লেপ টানিয়া তাদের চাপা দিয়া দ্বার ভেজাইয়া অন্নদা বাহিরে গেল মুখ-হাত ধুইতে!

আধ ঘণ্টা বাদে ফিরিয়া দেখে, আশু-মাখন তেমনি পড়িয়া আছে! সে ফ্লানেলের সার্টটি গায়ে দিয়া র‍্যাপার জড়াইয়া বাসার বাহির হইয়া গেল। চেৎলার ছেলেটির সন্ধানে গিয়া আর একটি ছেলের খোঁজ পাইয়াছে, খিদিরপুরে থাকে,—সেই খিদিরপুরের ছেলের সন্ধানে বাহির হইয়া গোলদীঘির ধারে সে ট্রামে উঠিল।

বাসায় পৌঁছিতে এগারোটা বাজিল। আশু ও মাখন বাসায় নাই—কোথায় গিয়াছে। ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিয়া সে খাইতে বসিল। রজনী কহিল—এত তাড়া যে!

অন্নদা কহিল—ধর্ম্মতলায় আমাদের ডেপুটী বাবুর সঙ্গে দেখা হলো। তিনি ভবানীপুরে এসে আছেন—ঠিকানা দিয়েচেন, একবার যেতে বলেচেন, তাই যাবো এখন।

আহারান্তে ঘরে আসিয়া সাজসজ্জা করিবে, দেখে, তার গায়ের কোটটা আলনায় নাই—খোঁজাখুজি করিয়াও কোট মিলিল না। বালিশের তলায় চাবি পড়িয়া ছিল, তোরঙ্গ খুলিয়া দেখে, তার মধ্যেও কোট নাই! মাতাল দুটা গায়ে দিয়া গেল না তো? তাই তো—

এক ঘণ্টা কোথা দিয়া চলিয়া গেল। আশু-মাখন ফিরিল। মাথার চুল রুক্ষ, মুখ বিশুষ্ক। অন্নদা কহিল—আজ তোমাদের দু'টাকা দিলে হবে তো?

আশু কহিল—আরো টাকা চাই···

অন্নদা কহিল—তারপরে হ্যাণ্ডনোট কাটতে হবে তো·? সব ফুঁকে দিলে আর কি করবে, বলো?

মাখন কহিল—হ্যাণ্ডনোট কাটি যদি তো সে-টাকা আমরাই শুধবো···

অন্নদা হাসিল, হাসিয়া কহিল—এখনো নেশা কাটেনি, দেখচি··· মোদ্দা আমার কোট দেখচি না যে। তোমরা জানো?

আশু হাসিয়া ফেলিল। মাখন কহিল—কাল টাকা চেয়েছিলুম বলে রাগ করে ধাক্কা দিয়েছিলে দাদা, তাই···

অন্নদা কহিল—তাই কি···?

আশু কহিল,—তোমার সে কোটটি আজ সকালে বাঁধা দিয়ে পাঁচ টাকার জোগাড় করেচি।

অন্নদা শিহরিয়া উঠিল। তারপর এক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া কহিল—ওরে হতভাগা, সর্ব্বনাশ করেছিস্···

দু'জনে অবাক্! অন্নদা কহিল—সেই কোটের লাইনিংয়ের মধ্যে তোমাদের ছ'খানা করে দশ টাকার নোট, আর আমার কুড়ি টাকার নোট একখানা ভাঁজ করে সেলাই করে রেখেছি যে···সহরে চোর আর পকেট-মারার ভয় বলে···সর্ব্বনাশ করেছিস্ রে হতভাগারা···মাতাল বল্‌লে আবার রাগ করিস্! এখন উপায়?

আশু-মাখন দুজনেই ভীষণ রকমে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সত্য, এখন উপায়?

অন্নদা কহিল—কোথায় বাঁধা দিয়েছিস্? রসিদ আছে?

মাখন কহিল—এই রসিদ···

অন্নদা পড়িয়া দেখে, ১২ নম্বর বৈঠকখানা রোডে সেখ মকরুদ্দিন ফিরিস্তিওয়ালার সহি দেওয়া একটা রসিদ—একটি গরম কোট বাঁধা পাঁচ টাকা, সুদ মাসে টাকায় দুই আনা করিয়া।···

অন্নদা কহিল—আমার কাছে পাঁচ টাকা তো নেই···রসিদ আর সে পাঁচটা টাকা দাও আমায়। ছুটি, দেখি, আদায় হয় কি না···তার পর ফিরে এসে তোমাদের সব টাকা ফেলে দিচ্ছি···

আশু কহিল—কিন্তু পাঁচ টাকা নেই তো···

অন্নদা কহিল—নেই! ··কোথায় গেল?

মাখন কহিল—রজনীর কাছে দিছি···

অন্নদা কহিল—কোথায় রজনীবাবু?

আশু কহিল—মানে, আজ বিকেল থেকে মাইফেলের জোগাড় হচ্ছে। আমাদের পাঁচ টাকা, আর রজনী দেছে পাঁচ টাকা···এই দশ টাকায় গরাণহাটার বেরাল খেঁদির ওখানে···

অন্নদা কহিল—থাম্ হতভাগা। দেখি, পাঁচটা টাকা কোথাও জোগাড় করে নিতে পারি কি না···সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসেছিস্··· দেখি,

ভবানীপুরে ডেপুটী রাখালবাবুর কাছ থেকে টাকা পাই যদি…তা · এ পোষাকে হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি না তো। আশুর কোটটা দে, আর মাখনের শালখানা…

আশু কহিল—আমার তো এই কোট ছাড়া আর দ্বিতীয় জামা নেই…

মাখন কহিল—আমার এ পাতলা কামিজের উপরে শাল না লাগালে শীতে বেরুনো দায় যে…

অন্নদা কহিল—এখন তো বারোটা…ভবানীপুর থেকে আমার ফিরতে বড় বেশী দেরী হয় যদি তো তিনটে…ফিরে বৈঠকখানা রোড থেকে জামা উদ্ধার করে তারপর তোদের টাকা দেবো, আর কোট আর শালও তখন ফেরত পাবি!

এ ছাড়া উপায়ও যখন নাই, অগত্যা আশু কোট খুলিয়া দিল… এবারে সদ্য তৈরী করাইয়াছে, কৃষ্ণনগরের বিশ্বনাথ প্রামাণিকের দোকানে। মাখন শাল খুলিয়া দিল। অন্নদা বাক্স-তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বাহির হইয়া গেল।

বেলা চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। অন্নদার এখনো দেখা নাই। পাঁচটায় গরাণহাটার বেয়াল খেঁদিব বাড়ী যাওয়ার কথা। রজনী সেইখানেই রহিয়া গিয়াছে—তার ফিরিবার কথাও নয়! আশুর গায়ে ময়লা সার্ট—মাখনের বাবুয়ানার প্রধান সম্বল সেই শাল…কোট আর শাল-হারা হইয়া দুজনেরই উদ্বেগের সীমা নাই! তাই তো, অন্নদা এখনো ফেরে না কেন?

আশু কহিল—মকরুদ্দিন সাহেব যদি বাসায় না থাকে?

মাখন কহিল—যদি কোট না দেয়?

আশু কহিল—হাকিমের কাছ থেকে টাকা যদি অন্নদা-দা না পেয়ে থাকে?

ভীষণ সমস্যা,! এ সমস্যার মীমাংসাও হয় না! সেদিন শীতটাও যেন বেশী পড়িয়াছিল। তাছাড়া অন্নদার সন্ধানে বাহির হইবে? যাইবেই বা কোথায়? ইতিমধ্যে অন্নদা আসিয়া তাদের না দেখিয়া যদি আর কোথাও বাহির হইয়া পড়ে? হায়রে, গরাণহাটার মাইফেল্‌—অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছে···বেরাল খেঁদির কথাবার্ত্তাও বেশ—তবে, সে বলিয়া দিয়াছে, তার টাইম্‌ একেবারে বাঁধা!

আশু কহিল—তোরি দোষ·· জামা বাঁধা দেবার মতলব তুই তো দিয়েছিলি···

মাখন কহিল—তুই বাক্স ভাঙতে চাইছিলি যে ··অন্নদা-দা যদি ভাঙ্গা বাক্স দেখে পুলিশে খপর দিত ···?

নাঃ, কোনো উপায় নাই!···ওদিকে ঐ যে কার ঘড়ি বাজিতেছে··· এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ···সর্ব্বনাশ!

যাঃ—পাঁচটা বাজিয়া গেল! সেই গরাণহাটা···রজনী একাই··· ওঃ, দশ টাকায় কি খাতির, কি আদরই না সে পাইতেছে! আর তারা? বেকুব, বেকুব! নিজের পয়সা পরের এস্তেজারির মধ্যে রাখিয়া বড়দিনটা কি ভাবেই না মাটী করিল!···

সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল। ছ'টা তখন বাজিয়া গিয়াছে···অন্নদার তবু দেখা নাই! বোর্ডিংয়ের মালিক আসিয়া কহিল,—আজ রাত্রে মাংস রান্না হচ্ছে। মাংসর দিন বোর্ডারদের চার আনা করে চাঁদা দিতে হয়। যাঁরা মাংস খাবেন না, তাঁদের রাবড়ি দেওয়া হয়, তার চাঁদাও চার আনা করে! আপনাদের দু'জনের আট আনা দিন্‌। আপনারা কি খাবেন? মাংস, না, রাবড়ি?

দুজনের ইচ্ছা হইল, এই লোকটার মাথায় মারে দুই ঘুষি! তারা মরিতেছে কি দুর্ভাবনায়, আর ইনি আসিয়াছেন চাঁদা কুড়াইতে!

আশু কহিল—অন্নদা-দা এলে তাঁর কাছ থেকে চাঁদা নেবেন। মালিক চলিয়া গেল।

আশু ডাকিল—মাখন…

মাখন কহিল—কেন?

আশু কহিল—এ পোষাকে তো গরাণহাটায় যাওয়া যাবে না…এই ময়লা সার্ট…

মাখন কহিল—আর আমার গায়ের কাপড় নেই। এই আধ-ময়লা ফ্লানেলের সার্টটা যদি সাবান দিয়ে ছাই কেচেও রাখতুম…

আশু কহিল—অন্নদা-দা মজালে…

মাখন কহিল—কাল রাত্রের সে জ্বালাতনের শোধ নিলে না তো!

আশু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ভগবান জানেন!…

সাতটা বাজিল। তা বাজিলেও মান খোয়াইয়া এ-পোষাকে গরাণহাটার মাইফেলে যোগ দেওয়া যায় না তো! কিন্তু বেরাল বৌদি টাইম দিয়াছে, পাঁচটা হইতে রাত্রি ন'টা! তারপর সে বাগানে চলিয়া যাইবে, বড় রকমের এনগেজমেণ্ট আছে…তাইতো, একটা স্ত্রীলোকের কাছে কি-ভাবেই খাটো হইয়া গেল! ছি! আর রজনী…? তাকে সঙ্গীত-সুধা-সায়রে ভাসমান কল্পনা করিয়া দু'জনের বুক কাঁপিয়া উঠিল—শীতে হাত-পা কাঁপিতেছিল।…

আটটা…নাঃ, আর কোনো আশা নাই! কিন্তু অন্নদা-দা মোটর-চাপা পড়িয়া মরিল না তো?

মরুক! অমন বন্ধুর বাঁচিয়া থাকায় কোনো লাভ নাই!

আশু কহিল—এক-আধ বোতল বীয়ারও যদি পাওয়া যেতো…মনটাকে চানকানো যেতো।

মাখন কহিল—হাত-পা কালিয়ে আসচে…

আশু কহিল—আমার ভিরমি যাবার জো…

মাখন কহিল—আমিও শুয়ে পড়ি ··কোনো আশা নেই আর—

আশু কহিল—সব মাটি !

রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে…

আশু, মাখন অনেকক্ষণ পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। অন্নদা ডাকিয়া তাদের তুলিল। ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র তারা মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অন্নদা কহিল—শোনো বাপু, সে মকরুদ্দিন সে-কোট ছাড়তে চায় না কিছুতে। সে বল্‌লে, এক মাসের কড়ার আছে—শেষকালে, বাধ্য হয়ে আমার কোট খালাস করে তার বদলে তোমাদের শাল আর কোট তার কাছে রেখে এসেচি। রসিদে তোমাদের দুজনেরি নাম আছে—দুটি জিনিষ বাঁধা রেখে পাঁচ টাকা—আমার গায়ে আমার সেই কোট। তোমাদের জিনিষ দুটি মকরুদ্দিন সাহেবের কাছে…রসিদে এই দেখো, লেখা, শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু মাখনলাল দে, সাং কৃষ্ণনগর, হাল সাং ৩নং পিরু খানসামার লেন, কলিকাতা—নিকট হইতে একখানি গরম কোট ও একটি রঙ্গিন শাল বন্ধক রাখিয়া পাঁচ টাকা নগদ কর্জ্জ দেওয়া হইল। মাসিক সুদের হার টাকায় দুই আনা। কড়ার একমাস। ইতি শ্রীমকরুদ্দিন সেখ, ৭২ নং বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা। ২৭শে ডিসেম্বর। এই নাও রসিদ…

আশু, মাখন অবাক! অন্নদা কহিল—আমি এখন চল্‌লুম ভবানীপুর ··কাল সকালে ডেপুটী রাখাল বাবুর বাড়ী মস্ত ভোজ। বলেচেন, আজ রাত্রেই আমায় যেতে হবে…আমার গাড়ী হাজির। তোরঙ্গ-পত্তর নিয়ে চললুম। তারপর অন্নদা হাঁকিল,—কোথায় রে ?

একজন মুসলমান ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সে ভাড়াটিয়া গাড়ীর

সহিস। অন্নদা কহিল—ওই বাক্সটা, আর এইগুলো···বিছনাটা গুড়িয়ে বেঁধে দিচ্ছি···দাঁড়া···

বিছানার মোট বাঁধা হইল। সহিসটা তোরঙ্গ ও বিছানার মোট লইয়া নামিয়া গেল। অন্নদা কহিল—তোমাদের টাকা? হ্যা, আজ এ-রাত্রে আর লাইনিং ছিঁড়ে টাকা বার করে তা সেলাই করা শক্ত। কাল না হয় দিয়ে যাবো···তোমাদের কালকের দিনের হাত-খরচের জন্য একটা টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তা ছাড়া ঘরের ভাড়া তো আগাম দেওয়া আছেই···আর বেশী খরচ দরকার হয় যদি তো এই নাও ডেপুটী বাবুর বাসার ঠিকানা, ১২ নং পাঁচু দত্ত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর—তাঁর ওখানে যেয়ো। গেলেই আমার দেখা পাবে। আপাততঃ তাহ'লে আজ একটু আরামে ঘুমোতে পাবো। কাল ঘুমের বড় ব্যাঘাত ঘটেছিল··· সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেচে, ত্যজ দুর্জ্জন-সংসর্গং, ভজ সাধু-সমাগমং··· হাঃ হাঃ হাঃ···

অন্নদা একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আশু, মাখন, এতক্ষণ যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল···বেয়াল খেঁদি, মাইফেল···সে-গুলা স্বপ্ন! অন্নদার অট্টহাসির আঘাতে সে স্বপ্ন ফাঁসিয়া চুর্ণ হইয়া গেল! দু'জনের চেতনা ফিরিল! চেতনা ফিরিতে আশু কহিল,—ভারী বড়াই করেছিলি যে! কেমন উল্টো চাপ দিয়ে গেল!

মাখন একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া পড়িল, কহিল,—আমার হার্ট ফেল হবে বোধ হয়, এখনি···আমায় কিছু বলিস্ নে···! মাখন শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিল।

দিনের আলোয়

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

পাড়ার বুকে মস্ত বস্তী······কয় ঘর গরিব গৃহস্থের বাস। কাজ-কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট সেখানে এখনো চোকে নাই! খাওয়া দাওয়া, ঘর ধোওয়া, বাসন মাজার সঙ্গে সঙ্গে বেদনার কত কাহিনী, কলহের কত সাড়াই জাগিয়া উঠিতেছে! বস্তীর গায়ে মস্ত তেতলা বাড়ী। সে-বাড়ীর বৈঠকখানায় বাজনার সুরে গান চলিয়াছে—

> তুমি কোন্ কাননের ফুল,
> তুমি কোন গগনের তারা......

ভাগ্যে ঐ বাড়ীটায় অমনি আলো-গানের সমারোহ চলে···নহিলে সারাদিন দুঃখ-ধন্দা করিয়া শ্রান্তি-জর্জ্জর এই বস্তীর লোকগুলা চারিদিককার সুগভীর নৈরাশ্যের মাঝে বুঝি দম বন্ধ হইয়াই মারা যাইত! ঐ আলো আর গানের সুরে সে কোন্ স্বপ্নলোকের কুহক-মাধুরীর স্পর্শ তারা পায়···!

ঘণ্টাখানেক পরে ওদিককার গানের সঙ্গে বস্তীর সাড়াশব্দও দীপের মত নিব-নিব হইয়া আসিল। দু'একটা বেদনার গুঞ্জন, বা শিশুর কান্না থাকিয়া-থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছে, কখনো-বা একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী বিপর্য্যয় শব্দে চারিদিককার স্তব্ধ সুষুপ্তির গায়ে ভারী রকমের আঁচড় টানিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে···

বস্তীর এক জীর্ণ ঘরের কোণে আঁচল পাতিয়া ঘরের তরুণী বধূ মূর্চ্ছিতার মত পড়িয়া ছিল। মাটীর দীপ তৈলের অভাবে তার

জলা শেষ করিয়া কখন্ নিবিয়া গিয়াছে। একধারে ছোট কাঁশি-ঢাকা খাবার। বধূ তার প্রহরায় বসিয়া থাকিয়া ঘুমে ঢুলিয়া মেঝের কখন গড়াইয়া পড়িয়াছে! মুখে-চোখে বেদনার করুণ আভাস তার তরুণ রূপশ্রীকে এমন ম্লানিমায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে দেখিলে শ্রাবণের মেঘ-ভরা পূর্ণিমা-রাত্রির কথাই চট্ করিয়া মনে পড়ে!

ঘরের বাহিরে জুতার দুপ্ দাপ্ শব্দ হইল এবং সবলে দ্বার ঠেলিয়া দৈত্যের মত একটা পুরুষ ঘরে ঢুকিল, ঢুকিয়াই ডাকিল—বকুল······ কণ্ঠের স্বর যেমন কর্কশ, তেমনি ঝাঁঝ তার মধ্যে!

বধূ ধড়মড়িয়া উঠিয়া আঁচলটা গায়ে জড়াইয়া বসিল। পুরুষ হাঁকিল,—ঘর অন্ধকার! দিব্যি আরাম করে ঘুমোচ্ছিস্ · ···এ্যাঁ···

অপ্রতিভ হইয়া বধূ চাহিয়া দেখে, দীপ নিবিয়া গিয়াছে। উপায়? ঘরে একটিও দিয়াশলাই নাই! ওদিকে ওরাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বধূ কাঠ হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

পুরুষ কহিল,--দাঁড়িয়ে রইলি যে···কথা শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বকুলের হাত ধরিয়া সে প্রবল ঝাঁকানি দিল। সে ঝাঁকানি বধূ সহিতে পারিল না; একধারে ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

পুরুষ বলিল,—আলো জ্বালো দয়া করে! খেতে-দেতে হবে আমায়।

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বধূ কহিল,—দেশলাই নেই। পিদিম নিবে গেছে!

—এই নাও দেশলাই—বলিয়া পকেট হইতে একটা দিয়াশলাই বাহির করিয়া সে বধূর গায়ে ছুড়িয়া দিল! বধূ দিয়াশলাই লইয়া দীপ জ্বালাইতে গিয়া দেখে, দীপে তেল নাই, দীপের বুকটা অবধি পুড়িয়া গিয়াছে। পলিতা-পোড়া ছাই বিদ্রূপের হাসির মত দীপের বুকের উপর! সে শিহরিয়া উঠিল।

পুরুষ কহিল—নবাব-নন্দিনী দাঁড়িয়ে রইলেন তবু!

বধূ কহিল,—তেল নেই।

একে প্রমত্ত অবস্থা, তায় মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার আনন্দ ও নেশার রেশ তখনো প্রাণ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই! ভাবিয়াছিল, ঘরে ফিরিয়া মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া বিছানায় দেহভার গড়াইয়া আরামে ঘুমাইবে, কিন্তু এ কি দুর্গ্রহ!

বধূর হাত দুইটা সবলে ধরিয়া দেওয়ালে তার মাথা ঠুকিয়া দিয়া মনের ঝাল সে কতক মিটাইল; তবু বধূ কাঠের পুতুলের মত নির্জীব দাঁড়াইয়া আছে! রাগ চড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর হইতে যে তরল সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছে, সে-সুধা তখন তার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছে! বধূর অঙ্গে প্রহারের জ্বালা সবলে বর্ষিত হইল! পড়িয়া মার খাইবে, তবু আলো জ্বালিয়া স্বামীর পরিচর্য্যায় মন দিবে না? ভালো আপদ! বধূর ঘাড় ধরিয়া পুরুষ-স্বামী তখন তাকে বাড়ীর বাহির করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল; সঙ্গে সঙ্গে সগর্জ্জনে জানাইল,—যেখানে খুসী চলে যা ··পা আছে, সামনে মস্ত পথ, এখানে আর ঠাঁই হবে না! স্বামীর মান রাখতে জানো না?

ঝড়ের নির্ম্মম আঘাতে তরুণ গাছ যেমন মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, বধূ তেমনি পথের মাঝে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

······কতক্ষণ!······

সহসা চেতনা পাইয়া বধূ উঠিয়া দেখে, নির্জ্জন পথ। একটু দূরে বড় রাস্তায় মোটরের ভেঁপু মাঝে মাঝে বাজিয়া যাইতেছে, তার পর চুপ-চাপ! ঐ সেই তেতলা বাড়ীটা···উপরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে! পথে গ্যাসের আলো···নির্ব্বাক নেত্রে যেন তারি দুঃখ দেখিতেছে··· বধূ উঠিয়া দ্বারে ধাক্কা দিল·· এক বার, দুই বার, অনেক বার! ভিতর

হইতে কাহারো সাড়া নাই! তখন নৈরাশ্য আর নিরুপায়তার কঠিন বাঁধন তাকে এমন করিয়া বাঁধিল যে তার চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইবার জো!

বধূ ভাবিল, নিত্য এ অত্যাচার, লাঞ্ছনাও তো আর সহা যায় না! কেন? কি তার অপরাধ? মার কোল ছাড়িয়া একা এই ঘরে কিসের আশায় সে পড়িয়া আছে? স্বামী! একটি দিনের জন্য এতটুকু আদর বা একটা মিষ্ট কথাও তো দেয় নাই! কেবলি পীড়ন! কায়-মনে এই সেবা, এই পরিচর্য্যা সে করিয়া আসিতেছে—কলের মত কাজ চলিয়াছে, কোনো-কিছুর প্রত্যাশাও সে রাখে না! শুধু একটু আশ্রয়, ঐ জীর্ণ ঘরের কোণে এত বড় বাহিরের অজানা রহস্যের অন্তরালে ঐ নিরাপদ জানা কোণটুকু···তা হইতেও আজ বঞ্চিত করিলে, পুরুষ! এ জীবন কেনই বা রাখা?···মরণই উপায়!

বেদনাহত নারীত্বের রুদ্ধ অভিমান তার চিত্তে দোলা দিয়া সাড়া তুলিল, আর কেন বাঁচিয়া থাকা! মরাই ঠিক! মরণের কোলে যা-কিছু আরাম! মরণেই মুক্তি!

কোনো দিকে না চাহিয়া সে তখন বুক বাঁধিয়া ঐ নির্জ্জন পথকেই সম্বল করিয়া চলিল! কিন্তু কি এ ভয়···সর্ব্বাঙ্গ ছম্ ছম্ করিতেছে! প্রতি পদক্ষেপে কে যেন দুই পা চাপিয়া ধরিতেছে!

একজন পথিক নিজের খেয়ালে গান ধরিয়া আসিতেছিল, এই দিকেই! চলার ভঙ্গী দেখিয়া বধূ শিহরিয়া উঠিল! এ চলার ভঙ্গী তার খুব চেনা! সহজ মানুষ এমন চলা চলে না! পা টলিতেছে ···গতি চপল, সারা পথটাকে এধার হইতে ওধার অবধি মাড়াইয়া চলিতেছে! ভয়ে সে একটা গ্যাস-পোষ্টের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

ভাবিল, দুনিয়ার পথে শুধু মাতালগুলাকেই ছাড়িয়া দিয়াছ, ভগবান!

নিজেকে প্রাণপণে খাড়া করিয়া মাতাল-পথিক কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, খুব মনোযোগী দৃষ্টিতে বধূকে লক্ষ্য করিয়া তারপর কহিল—কে বাবা, এই রাত্রে ভয় দেখাতে পথে বেরিয়েচো!

লজ্জায়, ভয়ে বধূ যেন মরিয়া গেল! সে আপনার ভীত কুণ্ঠিত দেহলতাটিকে যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া গ্যাস-পোষ্টটাকে নিরাপদ দুর্গের মত আঁকড়াইয়া ধরিল।

মাতাল আগাইয়া আসিল; তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল—বধূর চোখে অসহায়তার কি আর্ত্ত বেদনা, কি মিনতি ফুটিয়া উঠিল। মাতালের তা দৃষ্টি এড়াইল না!

মাতাল বলিল—কাদের মেয়ে তুমি, বাছা?

এ স্বরে কতখানি দরদ! বধূ কাঁদিয়া জানাইল, সে অতি-অসহায়···এত-বড় বিশ্বে তার গৃহ নাই, কেহ নাই!

মাতাল কহিল—এত রাত্রে পথে বেরিয়েচো, বাছা! বিপদে পড়বে যে!

বধূ তার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িল। মাতাল কহিল,—কোথায় ঘর? বলো তো মা আমায়।

মা! এ সম্বোধনে কি আশ্বাস! বকুলের বেদনার্ত্ত চিত্তে যেন এক ঝলক স্নিগ্ধ হাওয়ার পরশ লাগিল!

বধূ কহিল—বাড়ী থেকে আমায় তাড়িয়ে দেছে···সে পাগলের মত কাঁদিয়া উঠিল।

মাতাল কহিল—কে এত বড় হতভাগা বলো তো মা···? স্বামী? আমি একবার তাকে দেখচি।

সর্ব্বনাশ! তার সঙ্গে পারিবার জো কি! বকুল তো জানে, কি প্রচণ্ড শক্তি তার দেহে! প্রহারের স্মৃতি যে তার সর্ব্বাঙ্গে জাগিয়া আছে···অহর্নিশি! বধূ চুপ করিয়া রহিল।

মাতাল কহিল—বেশ, আজ এত রাত্রে আর চেঁচামেচি করবো না। কাল দেখা যাবে···। তা আজ পথে থাকা তো চলবে না, মা। আমার সঙ্গে এসো···

বধূ যন্ত্র-চালিতের মতই মাতালের সঙ্গে চলিল। মাতাল নীরব; বধূর মুখেও কোনো কথা নাই। হঠাৎ মাতাল থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—তাইতো, আমার ঘরে যে আর কেউ নেই, আমি একা!··· বলিয়া মাতাল থামিল, পরক্ষণে কহিল—তাতে কি! তুই মা, আমি ছেলে—কি এসে যাবে! আর······নিজের মনেই মাতাল বকিল,—আমি নীচের ঘরে থাক্‌বো'খন······মা আর ছেলে বৈ তো নয়!

ছোট্ট বাড়ীখানি। ভারী পরিপাটী···ছবির মত! আকাশে চাঁদের আলো···কি আরাম ও-আলোয় সব বেদনা ভুলাইয়া দেয়! সেই রুদ্ধ ঘরের আঁধার কোণে চাঁদের এই আলোর একটা বিন্দুও যদি ঝরিত কোনো দিন! পৃথিবীতে এত আলো ফোটে··· ···বধূর তা জানা ছিল না! জানিত, কিন্তু সে কথা কবে ভুলিয়া গিয়াছে!

দ্বারে কুলুপ আঁটা ছিল। মাতাল চাবি খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, বলিল,—আয় মা। কোনো ভয় নেই!

ভয়! যে-ভয় বুকের ভিতর ভরিয়া ছিল···প্রতি মুহূর্ত্তে ভয়ের কি সে বিভীষিকা!··· ···

বধূকে লইয়া মাতাল দোতলায় উঠিল; একটা ঘরের দ্বার খুলিয়া কহিল,—ঐ বিছানা রয়েচে—ঐখানে শোও মা। কোনো ভয় নেই। আমি নীচেই শোবো। ভয় পেলে চেঁচিয়ে ডেকো মা, 'ছেলে' বলে!

আমার নাম কান্তি। তবে বয়সে বড়, নেহাৎ কান্তি বলে ডাকতে যদি না পারো, তাই বলছিলুম, ছেলে বলে ডেকো। কথাটা বলিয়া মাতাল প্রাণ খুলিয়া হাসিল!

বধূ তখনো কেমন নিস্পন্দ! ঘটনাগুলা ছায়ার মত মনের উপর ছুটাছুটি করিতেছিল, ...এ কি সব সত্য, না, স্বপ্ন!...

মাতাল নীচে নামিয়া গেল; একটু পরেই ঠোঙায় খাবার লইয়া আবার উপরে আসিয়া দেখে, তরুণী তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, ঘরের সামনে ছোট বারান্দায়, কাঠের মত! জ্যোৎস্নার আলো তার সারা অঙ্গে ঝরিয়া পড়িয়াছে! মুখখানি ম্লান! চোখে কি দৈন্য, কি ব্যথাই যে ফুটিয়া আছে!

কান্তি কহিল,—দাঁড়িয়ে কেন মা—শোও'গে। তবে শুয়ে পড়বার আগে এইটুকু খেয়ে নাও। উপোসী থাকা ঠিক নয়, সধবা মানুষ! ভেবে কি করবে? সকাল হোক, আমি সব ঠিক করে দেবো। কোনো ভয় নেই।

এত আদর, এমন সহানুভূতি......এর অমর্য্যাদা করা চলে না! বধূ মুখে কিছু দিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। বেদনায় শ্রান্তিতে সারা দেহ-মন কাতর, অবসন্ন! তাছাড়া ভাবাও যায় না আর! কি-বা ভাবিবে? ভাবিয়া কি কোনো উপায় মিলিবে? না, ভাবনার কোনো কূল কিনারা আছে?

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া বধূ দেখে, খোলা জানলা দিয়া প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাস বহিয়াছে! চাঁদের আলো? না, চাঁদ...ঐ যে আকাশের এক কোণে জ্যোতিহীন পাণ্ডু মলিন মুখে হতাশের মত বসিয়া আছে! পথে লোক চলিতেছে! বকুল আসিয়া জানলার ধারে দাঁড়াইল। ঐ সে বস্তী...এত কাছে! যে-বস্তীতে তার ঘর...ঐ উঠান।

বস্তীর একটু অংশ ঐ দেখা যাইতেছে। উঠানে কে ঝাঁট দিতেছে…ও? মধুর মা! বধূর সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। ঐ বস্তী, ঐ বস্তীর ঘর…উহারি সঙ্গে তার এ-জন্মের যা-কিছু সম্পর্ক, যত পরিচয়! বেদনার লাঞ্ছনার সহস্র স্মৃতিতে ঘেরা ঐ ঘরই তার সব। এখানে দুঃখ ভুলিয়া একরাত্রি মাত্র বড় আরামে ঘুমাইয়া বাঁচিয়াছে! কিন্তু· ·

ঐ বস্তীতে ধীরে ধীরে কোলাহল জাগিতেছে!·· স্বামী ? এই সকালে তার খোঁজ পড়িবে! সবাই বলিবে, কোথায় গেল বকুল-বৌ? বাড়ীর সকলে তাকে বকুল-বৌ বলিয়া ডাকে। এমনি সময়েই ঘুম ভাঙ্গিয়া বিছানা ছাড়িয়া সে ওঠে, উঠিয়া ঘর-দ্বার ঝাঁট দেয়, উনুনে আগুন দিয়া তাড়াতাড়ি কলে গিয়া দু'কলসী জল আনিয়া তারপর রান্না চাপাইয়া দেয়। স্বামী কলে কাজ করে। সকালেই খাইয়া-দাইয়া বাহির হয়! আজো বাহির হইবে। কিন্তু আজ তাকে রাঁধিয়া দিবে কে? নিত্যকার সেই ছোট-বড় কাজ ·? আজ সে-সব পড়িয়া রহিল।

এখনি ছুটিয়া সে চলিয়া যাইবে?

বধূ দ্বার খুলিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল। ঐ একটা ঘর·· ঘরের সামনে আসিয়া দেখে, একটা তক্তাপোষে শয্যা বিছাইয়া কান্তি ঘুমাইতেছে! ডাকিয়া তাকে জাগাইবে? এই বেলা চলিয়া গেলেই ভালো হয়! এর বেশী বেলা বাড়িলে পাড়ার সকলে উঠিয়া পড়িবে! একটা কলরব উঠিবে! একজন অজানা পুরুষের সঙ্গে এই সকালে ফিরিতে দেখিলে সকলে যদি প্রশ্ন করে, কোথায় ছিলে রাত্রে ·? বধূর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মাথার ভিতর কেমন ঝিম-ঝিম করিতে লাগিল! সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া সিঁড়ির উপর সে বসিয়া পড়িল।

কাল রাত্রে এখানে বিছানায় নিরাপদ আশ্রয় পাইয়া সে ভাবিয়াছিল, ভারী বাঁচিয়া গিয়াছে! একটা রাত্রির মস্ত আরাম! তখন ভাবে নাই, এই একটি রাত্রি শেষ হইলে দিনের আলোয় কি নূতন শঙ্কা জাগিতে পারে! একটা অপর বাড়ীতে অজানা একজন পুরুষের আশ্রয়ে? সে যে নারী! নারীর শোচনীয় অসহায়তা কতখানি, তা সে জানে! আরো জানে, কত বড় মন এই তার আশ্রয় দাতার, কি দরাজ বুক! মানুষ এমন হয়, তা তার জানা ছিল না! কিন্তু স্বামী? বাড়ীর লোক··? তারা কি তা বুঝিবে? কে জানে! তারা জানে, নারী আর পুরুষ···মনের কোনো খোঁজও রাখেনা তারা! যদি কেহ এ কথা বিশ্বাস না করে?···তার গতি কি হইবে?

অত্যাচার, পীড়ন,—এ কথা সে ভুলিয়া গেল! কাল রাত্রে মরণের পথ খুঁজিয়া মরিতেছিল, সে কথা মনেও পড়িল না! শুধু মনে জাগিতেছিল, এই নিরাপদ নীড়ে আশ্রয় না লইয়া যদি ঐ ঘরের দ্বারে পথের উপরই পড়িয়া থাকিত·· তা হইলে দিনের আলোর সঙ্গে এই যে ভয় আর লজ্জা সাপের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে, তা তো দাঁড়াইতে পারিত না! সহস্র লোকের বিদ্রূপ-ভরা দৃষ্টি কাঁটার মত তার মনকে বিঁধিয়া ধরিতেছিল! একটি রাত্রির আড়ালে দিনের এই স্নিগ্ধ মৃদু আলোর উচ্ছ্বাসে এত কালি, এত লজ্জাও মেশানো ছিল, ভগবান!···

নীচের ঘরে কান্তি অঘোরে ঘুমাইতেছে। বধূ রেলিং ধরিয়া সিঁড়ির উপর নিস্পন্দ বসিয়া! মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মত কি সব কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছে···দুই চোখে যেন কে জলের ঝর্ণা খুলিয়া দিয়াছে···আশে-পাশে পল্লীর ঘরে-ঘরে তখন দিনের কোলাহল তার নির্ম্মম-প্রসারতায় ফাঁপিয়া ফুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে!······

ফ্রী-পাশ্‌

বার-চারেক বি-এ ফেল করিয়া বেকার বসিয়াছিলাম। মাঝে-মাঝে বাড়ীর তাগাদায় কাজের চেষ্টায় বাহির হইতাম, কিন্তু পনেরো টাকার এপ্রেন্টিশিতে ভর্ত্তি হইবার কথা মনে হইলে মাথা যেন কাটা যাইত!

এর কারণ ছিল। থার্ড-ইয়ারে পড়িবার সময় পাড়ার 'গজগামিনী' মাসিকের সম্পাদকের পাল্লায় পড়ি, এবং সেই-সময় হইতেই মাসিকের বাজারে নাম জাহির করিবার বাসনা মনে জাগে! কিন্তু হাত যখন কবিতার ছন্ত্রে, কি ছোট গল্পে কিছুতেই খুলিতে চাহিল না, তখন একখানা উপন্যাসের সমালোচনা লিখিয়া ফেলিলাম। সম্পাদক মহাশয় সেটা ছাপিয়া দিলেন তাঁর 'গজগামিনীতে'। সমালোচনাটা সম্পাদকের খুব ভালো লাগিয়াছিল! কেননা, এমন গালি দিয়াছিলাম যে, সম্পাদক বলিয়া ফেলিলেন, এমনি ঝাঁজালো সমালোচনায় মাসিকের ইজ্জৎ বাড়ে—বিশেষ যদি উপন্যাস-লেখক হয় নামজাদা। অর্থাৎ ভালো বইকে গালি আর রাবিশকে সোনা বলিয়া কাগজে ছাপিতে পারিলে সমালোচক ও সমালোচনাকে উঁচু-দরের বলিয়া লোকের ধারণা জন্মে।

ইহার পর আমার ঘাড়েই তিনি সমালোচনার ভার চাপাইলেন। যে-সব বই সমালোচনার জন্য আসিত, সেগুলার সমালোচনা আমিই লিখিতে লাগিলাম। সমালোচনার বইগুলি পারিশ্রমিক-স্বরূপ আমারই লভ্য হইত। আমিও সমালোচনায় ফিকির খাটাইতে সুরু করিলাম, অর্থাৎ—যে-সব বইয়ের চেহারা চোখে ভালো ঠেকিত, সেগুলার ভালো

সমালোচনা করিতাম, কেননা, সে-সব লেখক ও প্রকাশকের আরও বই ছাপা হইলে পাইবার আশা আছে; আর তার দ্বারা আমার ফ্যামিলি লাইব্রেরী ফাঁপিয়া উঠিবে !

এমনি ব্যাপার যখন চলিতেছে, তখন এক সার্কাসওয়ালার বই আসিল সমালোচনার জন্য ! বইখানা কিছুই নয়; অন্য কাগজে রাবিশ বলিয়াছিল—কিন্তু আমি তার খুব প্রশংসা বাহির করিলাম। সেই কোম্পানি তখন গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলিয়া বিপুল সমারোহে সার্কাস দেখাইতেছে। কাজেই আশা ছিল, প্রশংসার দরুণ একটা বক্স মিলিয়া যাইবে। আশাই বা কেন না হইবে ? আমার জানা ঐ ঘনশ্যাম একটা লক্ষ্মীছাড়া সাপ্তাহিকে প্রুফ-রীডারের কাজ করে, সেও যে বিনা-পয়সায় প্রায় থিয়েটার সার্কাস দেখিতেছে !

সমালোচনা বাহির হইল। কিন্তু পাশ আসে কি করিয়া ? তার ক্রীড়া-কৌশলের সমালোচনা তো আর মাসিকে ছাপা যায় না। দস্তুর নয় ! সম্পাদকের কাছে কথাটা পাড়িলাম। তিনি বলিলেন,—ইজ্জৎ যাবে !

তখন মাথায় এক ফন্দী আঁটিলাম। সম্পাদকের সঙ্গে সার্কাসের মালিকের জানা-শোনা ছিল, এ সংবাদ জানিয়া ছিলাম। তিনি বলিলেন,—যেদিন যাবে, বলো, কি গিয়ে আমার নাম করো।

এ আশ্বাস সত্ত্বেও ম্যাটিনিতে যাওবার ভরসা হইল না। কি জানি, যদি হঠাইয়া দেয় ! রাত্রে অন্ধকার আছে। ফিরাইয়া দিলেও কাজটা চুপি চুপি সারা হইবে ! কিন্তু রাত্রে ছিল আর এক মুস্কিল। শ্যামবাজার হইতে গড়ের মাঠে যাইবার সময় নয় ট্রামে করিয়া গেলাম, কিন্তু ফিরিবার বেলায় গাড়ী-ভাড়াই যে দেড় টাকা পড়িবে ! কথায় বলে, ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রয় ! তখন বাস্ ছিল না।

ও-পাড়ার সুধীরের ছিল ঘরের গাড়ী। ভাবিলাম, তাকে লইয়া গেলে ট্রাম-ভাড়া বাঁচে, গাড়ী-ভাড়াও বাঁচে! তাকে বলিলাম, সমালোচনার ফলে নিমন্ত্রণ পাইয়াছি সার্কাস দেখিবার। যদি গাড়ী দাও তো চলো আমার সঙ্গে। সে রাজী হইয়া গেল। রাত্রে তার গাড়ীতে চড়িয়া তাকে লইয়া সার্কাসে চলিলাম। মাঠের পথে কিছুদূরে গাড়ী রাখিয়া আমি নামিলাম। সুধীরকে বলিলাম,—দেখি, প্রোপ্রাইটার আছে কি না।

অর্থাৎ যদি লাঞ্ছনা হয় তো সুধীরের সাম্‌নে আর তা ঘটে কেন! শেষে বন্ধু-মজলিশে মান খোয়াইব!

আমি তখন একেবারে দৃপ্ত ভঙ্গীতেই গিয়া তাবুর সামনে হাজির হইলাম। সার্কাসের গেটেব সামনে চার-পাচটি বাঙালী, রঙ গাঢ় কালো,—ঝক্‌ঝকে সাদা পালিশ-করা ডবল-ব্রেষ্ট সার্টের উপর মিশ কালো অপেরা-ক্লোক গায়ে দিয়া এমন ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়াছে যে তাদের দেখিলে মনে হয়, এ তুনিয়াব জীব তারা মোটেই নয়! কোন্ উর্দ্ধ-লোক হইতে টপ্ কবিয়া এই গড়ের মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িয়াছেন! চোখের চাহনি হইতে পোষাক, চলাফেবার ভঙ্গী অবধি আগাগোড়া দর্পে ভরা! গা কাঁপিয়া উঠিল। ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে গেলে বুঝি এখনি গ্যাড্‌ম্যাড্ করিয়া উঠিবে! মিলিটারী গোরা সাহেবের কাছেও আগাইতে সাহস হয়, কিন্তু এই গাঢ় মিশ কালো সাহেব···

জোর করিয়া মনে সাহস আনিলাম। একেবারে গিয়া তাঁদের লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—গদাধর বাবু এসেচেন?

গদাধর বাবু 'গজ-গামিনীর' সম্পাদক। একজন জবাব দিলেন—না। জবাব দিয়াই তিনি নিজের পূর্ব্ব-ভঙ্গীতে আবার খাড়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমার পানে ভুলিয়াও দৃক্‌পাত করেন না দেখিয়া নিজের

মনেই আমি বকিয়া চলিলাম,—তাই তো! আমায় মিছে কষ্ট দিলেন এই রাত্রে,—শীতে! তারপর আবার বলিলাম,—তিনি কখন আসবেন, জানেন?

ভদ্রলোক তেমনি ভাবেই বলিলেন,—না।

ভদ্রলোক যেন আলাপ করিতেই চান না! আমার কান্না আসিল,—এটুকু দয়া মানুষের মনে কেন জাগে না? মানুষ মানুষকে এমন নির্মম অবহেলা দেখায় কেন? মুখের একটা কথা—তাতেও কার্পণ্য!

গাড়ীটার পানে চাহিলাম। বেচারা সুধীর খাড়া দাঁড়াইয়া আছে; আমার ইঙ্গিত পাইলে এখনি ছুটিয়া আসিয়া বক্স অধিকার করিয়া বসে! কিন্তু হায়, সে ইঙ্গিত দিই কি করিয়া!

এবার মরিয়া হইয়া বলিলাম—দেখুন, আমার নাম নধরকান্তি হালদার। গজগামিনীতে আপনাদের বইয়ের যে সমালোচনা বেরিয়েছে, সে সমালোচনা আমারি লেখা। তা আমাকে গদাধর বাবু আজ নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সার্কাস দেখবার জন্য, অর্থাৎ—সার্কাসের একটা সমালোচনা কোনো কাগজের জন্য আমায় দিয়ে তিনি লেখাতে চান্! তা, তিনি তো আসেননি। এলে বলবেন, আমি এসেছিলুম। আর তো দাঁড়াতে পারচি না—এই শীতে—এত রাত হলো, আমার সর্দ্দির ধাত,...

এক নিশ্বাসে যা-কিছু বলিবার ছিল বলিয়া ফেলিলাম। গদাধর-বাবু যে সে রাত্রে আসিবেন না, তা জানিতাম। কারণ তাঁর পায়ে এখন বাত চাগিয়াছে, ভদ্রলোক শয্যাগত!

আমার কথা শুনিয়া সেই কালো সাহেব-বাবুটি বলিলেন,—ওঃ, আপনার লেখা! তা গদাধর বাবু নাই এলেন—তিনি আসতে বলেচেন আপনাকে, আর এসে আপনি ফিরে যাবেন! তা হয় না। আসুন, সার্কাস দেখবেন। বলিয়াই তিনি হাঁকিলেন,—ওহে লালগোপাল—

তখন সার্কাসের ব্যাণ্ড একেবারে তাণ্ডবের তালে বাজিয়া উঠিয়াছে—বাহিরে মরণ-টান টানিয়া এখনি ভিতরে আসর রাখিতে ছুটিবে!

সাহেব-বাবুটির আহ্বানে চাঁদনীর আঁট্-সাঁট্ সিড়িঙ্গে সাহেবী পোষাক-পরা এক কৃশকায় বাঙালী যুবা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন,—এঁকে পাঁচ নম্বর বক্সে বসিয়ে দাও। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার তখন নিশ্বাস এমন জোরে বহিতে সুরু করিল যে, মনে হইল, প্রাণটাও বুঝি তার সঙ্গে ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসে! আমি বলিলাম, —আমার সঙ্গে আমার এক ফ্রেণ্ড আছেন!

সাহেব-বাবু বলিলেন—তাঁকে ডেকে আনুন!

তখন সুধীরকে ইসারা করিলাম। সে একেবারে টেলিগ্রাফিক মনি-অর্ডারের মত এক-নিমেষে আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইল, এবং দু' জনে ভিতরে গেলাম। তাঁবুর মধ্যে লোকারণ্য। তার মাঝে বক্সে বসিতে বুকখানা দশ হাত ফুলিয়া উঠিল। কালো সাহেব-বাবুটি পাণ আনাইয়া দিলেন, চা আনাইলেন। সার্কাস ভাঙ্গিলে সুধীর বলিল,—কাগজ-লেখায় সুখ আছে তো হে। তোফা খাতিরের সঙ্গে বক্স মেলে!

আমি বিজয়ী বীরের মত মাথা নাড়িলাম। গাড়ী-ঘোড়া টাকা-কড়ির মালিক এই সুধীরের পাশে নিজেকে একটা হীরো বলিয়া মনে হইল!…'কাগজওয়ালা' সর্ব্বত্র পূজ্যতে! তবু মনই শুধু জানে, কি মিছা কথা কহিয়াই এ বক্স আদায় করিয়াছি! ভাগ্যে আজ ভদ্র সাহেব-বাবুটি ছিল।

সার্কাসের দ্বারে বাজী জিতিয়া মনটা ফুলিয়া উঠিল। বাঙলা থিয়েটারওয়ালাদের দু'চারখানা চিঠি লিখিলাম, 'গজগামিনীর' ছাপানো চিঠির কাগজে ফ্রী-পাশ চাহিয়া। কিন্তু তারা এমন পাপিষ্ঠ যে সে চিঠির জবাব দেওয়াও ভদ্রতা ভাবিল না! প্রচণ্ড রাগ ধরিল। সে

রাগ এখনো আছে। যদি কোনো দৈনিক বা সাপ্তাহিকের সম্পাদকতা পাই কোনো দিন, তখন দেখিয়া লইব! কিন্তু সে কথা থাক্‌। আর এক রাত্রের কথা বলি।

সেবারে এক বিলাতী থিয়েটার-কোম্পানি আসিয়া এম্পায়ারে আস্তানা গাড়িল। খুব বড় বিলাতী এক্টর মার্ক থুসের দল। এক্টরকে একখানি চিঠি লিখিলাম যে, 'গজগামিনী' অতি প্রসিদ্ধ বাংলা মাসিক-পত্র; এবং তাহাতে বিশ্বের নাট্য ও অভিনয়-কলার তুলনা-মূলক আলোচনা বাহির করিবার আমাদের সঙ্কল্প আছে। তাঁরা যদি 'গজগামিনীর' সম্পাদকীয় বিভাগের দু'জন প্রতিনিধির জন্য প্রতিরাত্রে তাঁদের অভিনয়গুলি দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তবে আলোচনার পক্ষে ভারী সুবিধা হয় এবং···ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সুধীরের দরোয়ানকে দিয়া পিয়ন-বুকের মারফৎ চিঠি পাঠাইলাম। জবাব মিলিল, দুই তিন দিন পরে। এক্টর থুস সাহেব লিখিয়াছেন,—এই চিঠি-সমেত তাঁর এজেণ্ট মার্টিন হ্যারিসের সঙ্গে থিয়েটারে আসিয়া দেখা করিলে তিনি যথা-যোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

আনন্দে নাচিয়া উঠিলাম। সেই রাত্রেই সুধীরের গাড়ী জুতিয়া সুধীরকে লইয়া এম্পায়ারে চলিলাম। সুধীরের একটা পুরানো চেষ্টারফীল্ড কোট লইয়াছিলাম। নিজের ছিল না। চেষ্টারফীল্ড কোট না হইলে এই শীতের রাত্রে বিলাতী থিয়েটারে যাওয়া ভারী বিশ্রী দেখায়!

গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারে পা দিতেই গা ছমছম করিয়া উঠিল। আলোর একেবারে ঢেউ ছুটিয়াছে, আর তার মাঝে সাহেব-মেমের কি ভিড়! চলিতে পা বাধিয়া যায়!

সুধীরকে এক জায়গায় দাঁড় করাইয়া আমি গিয়া টিকিট-ঘরের

সামনে দাঁড়াইলাম। কাতারে-কাতারে সাহেব-মেম আসিয়া জমিতেছে; ঝন্-ঝন্ করিয়া টাকা ফেলিতেছে ও টিকিট লইয়া সরিয়া যাইতেছে! আমার চমক কাটিতে প্রায় দশ মিনিট কাটিল। তার পর অত্যন্ত ভীত নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—I want Mr. Harris (আমি মিষ্টার হ্যারিশকে চাই)

সামনেই এক সাহেব ছিল। সে বলিল, Yes, what do you want? (কি চাই?)

আমি মার্ক থ্সের চিঠি দিলাম। তিনি পড়িয়া বলিলেন,—Wait (সবুর কর)

হায়রে, এ কি সবুর করিবার কাল! সাড়ে ন'টা বাজিতে এক মিনিটি বাকী! তবু সবুর করিতেই হইবে! উপায় নাই! পাঁচ মিনিট পরে সেই সাহেব টিকিট-ঘরের বাবুটিকে চিঠি দিলেন। চাপকান-আঁটা কালো রঙের এক বাবু—ইয়া মোটা গোঁফ, দৃষ্টিতে হিংসা আর অপ্রসন্নতা একেবারে ঠাসাঠাসি মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে, কে বেশী ফুটিতে পারে, সেই চেষ্টায়—এমন দুই চোখ!

বাবু চিঠি পড়িয়া ভারী বিরক্ত স্বরে বলিলেন,—কে এনেচে এ চিঠি?

আমি খুব নরম গলায় বলিলাম,—আজ্ঞে, আমি।

বাবু বলিল,—এ আবার কি কাগজ? গজগামিনী! নাম কখনও শুনিনি! ডেলি, না, উইক্‌লি?

আমি বলিলাম,—মন্থলি!

বাবু একেবারে হাসিয়া লুটাইয়া সেই সাহেবকে বুঝাইয়া দিল যে, এ একটা বাঙলা মাসিক কাগজের চিঠি। এ কি হইবে? আমরা বাঙলা কাগজকে পাশ দিই না,—তা' ছাড়া এ আবার মন্থলি! বুঝলে

সাহেব—এর কাগজে যখন সমালোচনা বার হবে, তখন তোমার কোম্পানি থাকবে রেঙ্গুনে।—বলিয়া চিঠিখানা সাহেবের হাত দিয়া ফিরাইয়া আমায় বেশ জোর গলায় বলিল,—হবে না।

আমার তখন মনের ভাব? ওঃ, বলিবার নয়! যদি কেহ পাশের উমেদারী করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া থাকে তো সে বুঝিবে।

তবু একবার মরিয়া হইয়া বলিলাম—কিন্তু মার্ক থুস্ নিজে চিঠি দিয়েচে—

টিকিট-বাবু অকপট স্বরে বলিয়া দিল, তাঁর কোনো হাত নেই এ-ব্যাপারে। তাঁকে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে, তিনি শুধু দল লইয়া প্লে করিবেন—এ সবে তাঁর কথা খাটিবে না।

আশা নাই! কোনো আশা নাই! সাহেবের দলে যখন বিভীষণ বাঙালী আছে, তখন···

কট্‌মট্‌ করিয়া তার পানে চাহিলাম। পাষণ্ড, শয়তান—ওঃ! আকাশের বজ্র—না, তারো কোনো হাত নাই!

চারিধার ভূমিকম্পের বেগে দুলিয়া উঠিল। আলোগুলা হলদে ফুল বলিয়া ভুল হইতেছিল—তবু একবার সুধীরের পানে চাহিলাম। সে উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বুকে একটা ধাক্কা লাগিল! এত বড় অপমান!

ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া একধার দিয়া হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিলাম। তখন অনেক রাত! সুধীরকে দেখা দিই নাই! পরদিন সকালে লোক-মারফৎ সুধীরের চেষ্টারফীল্ড ফিরাইয়া দি; আর এ-পর্য্যন্ত তার সঙ্গে দেখা না করিয়াই কাটাইয়া আসিতেছি!

বিজ্ঞাপনের ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

বসুমতীর বিজ্ঞাপন

নিতাই চাটুয্যের বাড়ী চুঁচুড়ায়, বয়স একুশ-বাইশ বছর। সংসারে মা-বাপ, ভাই-বোন কেহ নাই। আছেন এক বিধবা পিশিমা। পিশিমা শুচিবায়ুগ্রস্ত। দিনের বেশীর ভাগ জলেই তাঁর বাস; জল লাগিয়া হাতে-পায়ে হাজা হইয়াছে; সংসার হাজিয়া গেলেও সেদিকে তাঁর নজর পড়ে না। তাই নিতাইয়ের সংসারে সুখ নাই; তবে বাপের পয়সা-কড়ি কিছু আছে, জমি-জমাও মন্দ নাই; কাজেই নির্ভাবনায় তার দিন কাটে।

হুগলি কলেজ হইতে আই-এ পাশ করিয়া নিতাই কলিকাতায় বি-এ পড়িতে গিয়াছিল,—এক বিষম উৎপাতে বি-এ পাশের আশা ত্যাগ করিয়া কলেজ ছাড়িয়া বাড়ীতে আসিয়া বসিয়াছে। উৎপাত এমন কিছু নয়, নিতাই বিষম তোৎলা—কলিকাতার কলেজের সহপাঠীর দল বিধি-দত্ত তার এই দৌর্ব্বল্যের প্রতি এমন নির্ম্মম অত্যাচার করিত যে, তা সহ্য করিতে না পারিয়াই সে বেচারা কলেজ ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছে।

এখনও তার বিবাহ হয় নাই। পিশিমা সেজন্য অনুযোগ তোলেন। কারণ অনুযোগ তোলাই বাঙালী পিশিমার স্বভাব! কিন্তু নিতাই বিবাহের নামে শিহরিয়া ওঠে। পল্লীগ্রামের মেয়ে বিবাহ করিতে তার একান্ত অনিচ্ছা, তারা তেমন জীবন্ত নয়, যেন মাটির পুতুল! সহরের মেয়ে লেখাপড়া জানে; তা ছাড়া তাদের সারা

অবয়বে জীবনের হিল্লোল! তোৎলামির জন্য ওকালতির কোনো আশা সে রাখে না—ডাক্তার হইবারও উপায় নাই। তোৎলা ডাক্তারের পশার হওয়া অসম্ভব! এ-কালের ফ্যাশনে সে একটু-আধটু সাহিত্য-চর্চ্চা করে; অর্থাৎ কবিতা লেখে, গল্প লেখে। লিখিয়া নিজেই পড়ে, পড়িয়া মশ্‌গুল্ হয়; মশ্‌গুল্ হইয়া ভবিষ্যতের কত রঙীন ছবি মনের মধ্যে গড়িতে থাকে! সহরের একটি শিক্ষিতা মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করিয়া পৈতৃক পয়সা-কড়ি যা আছে, তাহারি উপর নির্ভর করিয়া কোনোমতে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনটুকু কাটাইয়া দিবে, ইহাই তার সঙ্কল্প।

কাল সহরে মেয়ে দেখিতে গিয়া নিতাই সত্য বিষম অপমান সহিয়া আসিয়াছে। মেয়েটি তারি পাড়ার কিশোরীর শ্যালিকা। কিশোরী তাকে সঙ্গে লইয়া যায় মেয়ে দেখাইবার জন্য। মেয়ে দেখিয়া নিতাইয়ের পছন্দও হয়; কিন্তু তার পর কিশোরীর সঙ্গে দুই-চারিটা খোশ্-গল্প করিতে গেলে তোৎলামির মাত্রা এমন বাড়িয়া ওঠে যে, তার কণ্ঠশিরার স্ফীত সে মূর্ত্তি ও মুখের ভঙ্গী দেখিয়া অন্তরাল-বর্ত্তিনী কামিনীকুলের তীব্র হাস্য লাঞ্ছনার সশব্দ হুঙ্কারে ফাটিয়া পড়ে; এবং নিতাই তাহাতে দারুণ অপমান বোধ করিয়া চলিয়া আসে!

বৈকালের দিকে রৌদ্র তখন গড়াইয়া পড়িয়াছে। নিতাই হোমিওপ্যাথির বই দেখিয়া ষ্ট্রামোনিয়াম থ্রী এক ডোজ খাইয়া এ-সপ্তাহের 'সাপ্তাহিক বসুমতী' লইয়া বাড়ীর সামনেকার রোয়াকে আসিয়া বসিল। কাগজখানা খুলিয়া প্রথমেই রাজ্যের খবর পড়িতে লাগিল। সাংহাই বন্দরে প্রচণ্ড ঝড় হইয়া গিয়াছে, সে ঝড়ে একখানা বড় জাহাজ উল্টাইয়া প্রায় তিনশো লোক মারা গিয়াছে। নভো-স্কোভিশায় এক জুতাওয়ালার দোকানে আগুন লাগিয়া তিন লক্ষ

টাকার জুতা পুড়িয়া গিয়াছে। বোর্ণিওতে প্রচুর বৃষ্টিপাত; পোর্ট-সৈয়দের এক রমণী এককালে সাতটি সন্তান প্রসব করিয়াছে, সন্তানগুলি আকারে ঠিক দেড় বিঘৎ পরিমাণ—এমনি বিচিত্র সংবাদ পড়িয়া বিরক্ত হইয়া সে বিজ্ঞাপনের দিকে মনঃসংযোগ করিল। প্রথমেই চোখে পড়িল, 'বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের গুদাম সাবাড়' কলমে। এক টাকায় ৫৭ খানি বই। তার পরই এ কি—তোৎলামির দাওয়াই! নিতাইয়ের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সেই বিজ্ঞাপনটি সে পড়িতে লাগিল :—

আর ভয় নাই! আর ভয় নাই!!

বাক্-ফুট্ বটিকা

চন্দ্রালোকিত নিশীথে রুদ্ধ কক্ষে গুরুজনের মান বাঁচাইয়া, শাসন সাম্‌লাইয়া তরুণী নববধূর সঙ্গে অবাধ প্রণয়ালাপে আর বাধা নাই। 'প্রিয়ে' কথাটি উচ্চারণ করিতে তিন ঘণ্টা কশরতেও যাঁর মুখ দিয়া ঐ দুটি অমৃতময় ললিত সম্ভাষণ বাহির হয় না, এমন প্রচণ্ড তোৎলার তোৎলামিও এক শিশি বড়ীতে আরাম করিয়া দিব; না দিলে মূল্য ফেরৎ। মূল্য ১৫০ বড়ি—দশ টাকা; ১০০ বড়ি—আট টাকা; ৫০ বড়ি—পাঁচ টাকা। সঙ্গে উপহার আছে,—একখানি রজার্শের তিন মুখো ছুরি, একখানি সিল্কের রুমাল ও এক ডজন ছবি খাটাইবার পেরেক।

শ্রীহংসেশ্বর সাহা

৫৭ নং ফুলিয়া ঢোল লেন, আহিরীটোলা,

কলিকাতা।

নিতাই বার-বার বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিল ; তার পর কাগজখানি ভাঁজ করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সামনেই উঠান,—একরাশ দোপাটি ফুটিয়াছে, তা-ছাড়া কোণের টগর গাছে অজস্র ফুল, তার পাশে কল্‌কে ফুলের গাছগুলাও হল্‌দে রঙের ফুলে একেবারে আচ্ছন্ন। উঠানে পা দিতেই নিতাই দেখে, শশী ভট্‌চায্যির মেয়ে পুঁটী পট্‌-পট্‌ করিয়া ফুল ছিঁড়িতেছে। নিতাই বলিয়া উঠিল,—পু-পু-পু-পু-পু-পু··

পুঁটী ফিরিয়া এক-গাল হাসিয়া আঁচল ঘুরাইয়া বলিল—ফু-ফু-ফু-ফু-ফু-ফু···

নিতাই বিষম রাগিয়া উঠিল,—একে না বলিয়া ফুল চুরি, তার উপর একরত্তি মেয়ে, তার মুখের উপর এমন ভাবে বিদ্রূপ করে! সে ডাকিল—প্যা-প্যা-প্যা-প্যা-প্যা—অর্থাৎ সে ভৃত্য প্যালাকে ডাকিবাব প্রয়াস করিতেছিল।

পুঁটী হাসিয়া বলিল,—আর ব্যা-ব্যা-ব্যা করে ভ্যাড়া ডাকতে হবে না। যে ফুল নিয়েচি, তাতে ছোট খুড়ীর পূজো কাল খুব হয়ে যাবে···বলিয়াই সে ভোঁ-দৌড়!

নিতাই নিরুপায় রোষে ফুলিতে লাগিল। একটা কথাও যে সে বলিতে পারিল না—ভর্ৎসনার মৃদু একটা ইঙ্গিতও··এইটাই তার জীবনের মস্ত ট্রাজেডি!

সে গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া একটা টাইম-টেব্‌ল্‌ সংগ্রহ করিল এবং তার পাতা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া মনে মনে কহিল,—ঠিক! কাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ১২—৫০এর ট্রেণে কলিকাতা রওনা হইতে হইবে,—হাবড়ায় পৌছিবে বেলা আড়াইটায়। সেখান হইতে বাসে চড়িয়া পুল পার হওয়া—এবং পার হইয়াই নিমতলার ট্রামে চড়িয়া

আহিরীটোলায় হংসেশ্বর সাহার দোকান! পাঁচ টাকা দিয়া পঞ্চাশটা বড়ি লইয়াই দেখা যাক্, তার পরে···সারে যদি—আঃ!

কিন্তু কিশোরীর শ্যালিকা···? না। তারা সাধিয়া পায়ে ধরিলেও ও-মেয়ে বিবাহ করা হইবে না! অভদ্র, বর্ব্বর—নারী হইয়া এমন নির্লজ্জ ভঙ্গীতে যারা বিদ্রূপ করিতে পারে, তাদের মধ্যে বাস করিয়া যে-মেয়ে ডাগর হইয়া উঠিয়াছে, হাইকোর্টের জজের গৃহিণীও যদি সে কখনো হয়, হউক—তা বলিয়া নিতাই চাটুয্যের জীবন-সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্যতা তার কখনো থাকিতে পাবে না!·· নিতাই এখনই এই···যখন দু'চারখানা উপন্যাস ছাপাইয়া বাহির করিবে? সে-ও চাটুয্যে! বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সগোত্র যখন, তখন···

অদূর-ভবিষ্যতেব বিজয়ের রঙীন আভাস বিদ্যুতের দীপ্তির মত তার মনের মধ্য দিয়া বহিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হংসেশ্বর সাহা

দৈবের বিড়ম্বনা! ক্যালকাটা-টাইম ২-৩৪এ হাওড়া-ষ্টেশনে আসিয়া যখন লোকাল প্যাসেঞ্জার থামিল, তখন আকাশ ফাটিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে। ভাগ্যে বর্ষাতি-কোটটা নিতাই সঙ্গে আনিয়াছিল। তা আনিলেও···সে ভাবিল, কলিকাতার রাস্তায় তো আর রাস্তা মিলিবে না—এ বৃষ্টিতে ট্রাম নিশ্চয়ই বন্ধ। বাস্‌ও আবার নিমতলার

পথে চলে না। ট্যাক্সি অগ্নিমূল্য! তা-ছাড়া জলের মধ্যে ট্যাক্সি যদি থামিয়া যায়, তাহা হইলে ত্রিশঙ্কু হইয়া সেই জলের মধ্যেই তাকে বসিয়া থাকিতে হইবে। ঘোড়ার গাড়ীও কোন্ না জলের মরশুমে দু'টাকা ভাড়া চাহিয়া বসিবে!...

কোনো উপায় স্থির করিতে না পারিয়া সে বর্ষাতিটা গায়ে চড়াইল। সঙ্গে ছিল চামড়ার ষ্ট্রাপে বাঁধা থার্ম্মো-ফ্লাস্ক। কলিকাতায় ক'মাস থাকিয়া সে ভারী চা-খোর হইয়া পড়িয়াছে। দু'তিন ঘণ্টা অন্তর চা চাই। বেকার—ঘরে বসিয়া থাকে, কাজেই, টাইম-মত চা পাইতে কোনো অসুবিধা ঘটে না। এখানে যখন আসিয়াছে, তখন কোন্ না চার-পাঁচ ঘণ্টা বাহিরে কাটিবে। তাই সাবধানের বিনাশ নাই—এই পুরাতন প্রবচন স্মরণ করিয়া থার্ম্মো-ফ্লাস্কে গরম চা ভরিয়া সে সঙ্গে লইয়াছে! থার্ম্মো ফ্লাস্ক ষ্ট্রাপ সমেত গলায় ঝুলিতেছে। সব তো ঠিক...কিন্তু এই জলে পথে বাহির হওয়া যায় কি করিয়া?...

যাত্রীর দল কিন্তু সেই বৃষ্টিতেই কোঁচা গুটাইয়া ছাতা মাথায় প্লাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইতেছে। প্লাটফর্ম্মের রেলিঙের বাহিরে ক'খানা বাস...সকলেই জোর গলায় যাত্রী ডাকিতেছে,—কালীঘাট-কালীঘাট! শ্যামবাজার-শেয়ালদা! পার্কসার্কাস্—মৌলালি—

তাদের আহ্বানে নিতাইয়ের প্রাণ সচেতন হইয়া উঠিল। প্লাটফর্ম্মে নিষ্কর্ম্মা দাঁড়াইয়া যখন লাভ কিছু নাই...

সে চট্ করিয়া গিয়া একটা বাসে চড়িয়া বসিল। বাসটা তখন যাত্রীতে নাগরি-বোঝাই হইয়া গিয়াছে! ঠাশাঠাশি-গাদাগাদির অন্ত নাই! এত লোক যে, এমন ফাঁক-নাই—যার মধ্য দিয়া মক্ষিকা গলিতে পারে! বাসের ফিরকি বন্ধ; লোকগুলা বাংলার ইতিহাসের বহু-পুরাতন সংস্করণে-ছাপা সেই অন্ধকূপ-হত্যার কথা স্মরণ করিয়া

কণ্ডাক্টরকে ভৎর্সনা করিতেছে,—আর কত নেবে হে? প্রাণে মারবে না কি! যে-সব যাত্রীর পাব্লিক স্পিরিট একটু বেশী, তারা সরোষে শাসাইতেছে, খবরের কাগজে লিখে দিচ্ছি, বাস চালিয়ো তখন। সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রাণ যাত্রীর কাতর আবেদন,—আহা, না, না মশাই, হোক্ গে কষ্ট! স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রীটাকে তা বলে মারবেন না! পাব্লিক-স্পিরিট যাত্রী দু'পাশের দুই কাবলির আড়াল হইতে সবেগে মাথা নাড়া দিয়া বলিল—রেখে দিন্ স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্রী, মশায়! আগে প্রাণটা বাঁচানো চাই, তবে তো ইণ্ডাষ্ট্রী করবো…

এমনি কলহ-কলরবের মধ্যে বর্ষাতি-গায়ে নিতাই আসিয়া বাসে চড়িল। ন স্থানং তিলধারণং! কোনোমতে সে দাঁড়াইয়া রহিল। কাঁধে-ঝুলানো থার্ম্মো ফ্লাস্কটা এক বৃদ্ধের মাথায় ঠক্ করিয়া লাগিল। তিনি কহিলেন,—আঃ, এটা আবার কি, মশাই…?

অপ্রতিভভাবে নিতাই কহিল,—থা-থা-থা-থা…এই অবধি বলিতেই তার গলার শিরগুলা প্রচণ্ড স্ফীত হইয়া উঠিল! মুখ-চোখ লাল! দেখিয়া পাশের এক যাত্রী কহিল—মুন্—অর্থাৎ থা-থা-থা-থা-মুন্! মারা যাবেন কি শেষে!

নিতাই চুপ করিল। তার রাগ ধরিল, যেখানে যাই, সর্ব্বত্র এই বিদ্রূপ! আচ্ছা, বটিকা আনি—তার পর যখন কথায় বান ছুটাইয়া দিব…

বাস চলিল—চলিতেই এক-পর্ব্ব মাথা-ঠোকাঠুকি। যাত্রীরা টাল সামলাইয়া লইল। কণ্ডাক্টরের হাঁকুনির তখনো বিরাম নাই,—কালীঘাট—কালীঘাট—কালীঘাট—চালাও…

আঃ! যাত্রীরা ড্রাইভারকে কহিল,—দেখো বাপু, একটু সাম্লে …শেষে জলসই করে দিয়ো না…

হাবড়ার পুলের ধারে নিতাই নামিয়া পড়িল। বাহিরে জল! তা হোক্, ভিতরে ওই ভিড়ে দম বন্ধ হইবার জো!

ফুটপাথের ধারে কখানা রিক্‌শ দাঁড়াইয়া ছিল,—ছুটিয়া তার একখানায় চাপিয়া নিতাই বলিল—চলো আহিরীটোলা।...

রিক্‌শ-কুলি ঠং-ঠঠং-শব্দে ঘণ্টা বাজাইয়া বাঁদিকে মোড় লইয়া জলরাশি ভেদ করিয়া উত্তর-মুখে চলিল।...

জল ভাঙ্গিয়া বহু কষ্টে হংসেশ্বর সাহার বটিকা-ভবনের সাক্ষাৎ মিলিল। কিন্তু সাহা মহাশয় গৃহে নাই। এই জলে আবার এখনই চলিয়া যাইবে, বিশেষ সেই চুঁচুড়া হইতে আসিয়া? এমন বেকুব নিতাই নয়। কাজেই, হংসেশ্বর সাহার একতলা বাড়ীর রোয়াকে সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ফুলিয়া ঢোল গলি তখন ছোট নদীর আকার ধারণ করিয়াছে এবং ঘোলা ময়লা জলের স্রোতে রাজ্যের নোংরা আবর্জ্জনা ভাসিয়া চলিয়াছে।

ওধারে কার বাড়ীতে গ্রামোফোন চলিতেছে।...একটা বাড়ীর ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিল। বৃষ্টি আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ধরিয়া গিয়াছে। নিতাই বিরক্ত হইয়া ফ্লাস্ক খুলিয়া একটু চা পান করিয়া গলা ভিজাইল; তার পর ফ্লাস্কে ছিপি আঁটিল। সামনেই একটা দোতলা বাড়ী। দোতলার খড়খড়ি কে সশব্দে খুলিয়া দিল। নিতাই মুখ তুলিল। মুখ তুলিতেই দেখে, খড়খড়ির ধারে একটি তরুণী। তরুণী পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পানে ফিরিয়াও চাহিল না। নিতাই ভাবিল, তরুণী নিশ্চয় প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে...এই জলে কি করিয়া প্রিয়তম গৃহে ফিরিবে? ...হায় রে, তার জন্ত এমন করিয়া পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার কেহ নাই! কোথায় কত দূরে সে আছে, কি করিয়াই বা গৃহে পৌছিবে!

গৃহই বা তার কি, কে বা আছে। হংসেশ্বর সাহাব এই রোয়াক, আর চুঁচুড়ায় তার গৃহ…এ'দুয়ে তফাতই বা কি। সেখানে নয় একটা ঘর, সে-ঘরে বিছানা আছে, এখানে সিমেণ্ট-ফাটা এই নোংবা রোয়াক …দর একই। সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু মুদিল।

হঠাৎ পাশে কে কহিল,—কাকে চান?

চমকিয়া নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া দেখে, এক জন লোক, হাতে জুতা, বগলে ছাতা, কোঁচাব কাপড়টা গুটাইয়া ধরিয়া জল ভাঙ্গিয়া আসিয়া হংসেশ্বরের রোয়াকেব সামনে দাঁড়াইয়াছে।

সে কহিল,—হ—হ—হ—হ—

লোকটি কহিল,—বুঝেচি। হংসেশ্বব সাহাব কাছে এসেচেন? তা আমিই শ্রীহংসেশ্বব সাহা।

এই লোক? চেহাবা দেখিলে মোটেই মনে হয় না যে, এমন দাওয়াই সে দিতে পাবে—যার প্রসাদে অবোলা নিতাইয়ের মুখে বোল ফুটিবে।

হংসেশ্বর কহিল,—আসুন। বলিয়া সে বোযাকেব উপবে উঠিয়া সামনের চাবি-বন্ধ ঘরেব দ্বার খুলিয়া দিল, তার পব ঘবে ঢুকিয়া জানালা খুলিল। নিতাই তাব অনুসবণ করিয়া ঘবে ঢুকিয়া দেখে, ঘরখানি ছোট, মেজের উপব স্তূপাকাব কাগজপত্র, কাইযের ভাঁড়, ভি পি পাঠাইবাব ফর্ম্ম কতকগুলা, কাগজের বাক্স একরাশ, একটা মস্ত দোয়াত, তার পাশে কালি-মাখা অপূর্ব্ব রংয়ের ষ্টীলপেন, আর এক কোণে একটা কপাট-ভাঙ্গা জীর্ণ কাঠেব আলমারি, তাব মধ্যে নানা সাইজেব কতকগুলা শিশি, আলমারির মাথায় টিনের একটা ছোট প্যাটরা।

হংসেশ্বর তাকে বসিতে বলিয়া আলমারি হইতে সিগারেটের

প্যাকেট বাহির করিল ও একটা দেশলাই লইয়া সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই নিতাইয়ের সামনে রাখিয়া কহিল,—নিন্—আমি আসচি···

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে সিগারেট খায় না।

হংসেশ্বর বিস্মিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। নিতাই ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিল,—তার সন্দেহ হইল, এ কি সম্ভব! একটা গাঁজাখুরী বিজ্ঞাপন পাড়িয়া পয়সা খরচ করিয়া এই জলে ··তা ছাড়া বাঙলা কাগজের বিজ্ঞাপনও মানুষ বিশ্বাস করে? তার যেমন গ্রহ!···

হংসেশ্বর আসিয়া একটা গামছায় মুখ-হাত মুছিয়া কহিল—তার পর? আপনি কি ওষুধের জন্য এসেচেন?

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

—কত দামের শিশি চাই?

নিতাই কহিল—পাঁ—পাঁ—পাঁ—পাঁ···

—ও, পাঁচ টাকার।

নিতাই আবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

হংসেশ্বর উঠিয়া প্যাটরা খুলিল; এবং একটি ছোট শিশি বাহির করিয়া নিতাইয়ের হাতে দিল; তার পর আলমারির মধ্য হইতে একটা কাগজের বাক্স বাহির করিয়া কহিল—এগুলো উপহার! বলিয়া সে একটা কাগজ টানিয়া 'ক্যাস মেমো' লিখিয়া কহিল,—পাঁচ টাকা দিতে হবে।

নিতাই পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট লইল, লইয়া হংসেশ্বরের হাতে দিল। হংসেশ্বর সস্মিত মুখে নোটখানা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া সামনের ছোট কাঠের বাক্সের

মধ্যে পূরিল; তার পর কহিল,—দেখুন, রোজ গোটা আষ্টেক বড়ি খাবেন,—ভোরে দুটি, দুপুর বেলায় চারটি, আর রাত্রে শোবার সময় দুটি। ঐ সঙ্গে পথ্যও আছে—গাওয়া ঘী এক ছটাক ক'রে জিভে মাখাবেন রোজ দশ-পনেরো মিনিট ধ'রে—ঠিক খাবার আগে। তার পর দুবেলা সাবু আর কলাইয়ের ডাল চুমুক দিয়ে খাবেন। অর্থাৎ শক্ত জিনিষ নিষেধ। মানে, জিভটা খুব পোছলা করে রাখতে হবে; কথা সব তখন গড়্‌গড়িয়ে বেরিয়ে আস্‌বে, বাধবে না। তার পর অজানা লোক দেখলেই কথা কবেন—বুঝলেন! বড়ি আরো দুশিশি খেতে হতে পারে, তবে কারো-কারো এই পঞ্চাশ বড়িতেই উপকার হয়!

নিতাই বড়ি লইয়া উঠিতে উদ্যত হইল। হংসেশ্বর কহিল,—একটু বসুন। কোথাই বা যাবেন? পথে জল এখনো কমেনি—বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল; পাঁচ মিনিট পরে একটা লিমনেডের বোতল ও কলাপাতায় মোড়া এক পয়সার খিলি পাণ আনিয়া কহিল,—একটু আজ্ঞে হয়। মানে, আমি এখানে থাকি না। এ হলো আমার আপিস্। আমি থাকি শালকেয়।

বিস্ময়ে নিতাই অবাক্! শালিকায় বাসা—অথচ এই আহিরী-টোলার এক অন্ধ-গলির মধ্যে আসিয়া অফিস খুলিয়া বড়ি বিক্রয় করে! কিন্তু হংসেশ্বর পর-মুহূর্ত্তেই তার সে বিস্ময় ভাঙ্গিয়া দিয়া কহিল—এ ঘরটির জন্য জন্য ভাড়া দিতে হয় না,—আমাদের এক জ্ঞাতির বাড়ী। জ্ঞাতিটি মারা গেছে,—বিধবা স্ত্রী আছে, ছেলে-মেয়ে আছে; এদের বিষয় আশয় দেখা-শুনা আমাকেই করতে হয় কি না।

নিতাই লিমনেড স্পর্শ করিল না, পাণের খিলি খুলিয়া পাণ দুইটা মুখে গুঁজিয়া কহিল,—আ-আ-আ-স্ স্—

হংসেশ্বর কহিল,—আসুন। তিন-চারদিন বড়ি খেয়ে কেমন থাকেন, দয়া করে জানাবেন। এই অবধি বলিয়াই দেখিল, উপহারের প্যাকেট নিতাই ফেলিয়া যাইতেছে। সেটা তুলিয়া নিতাইয়ের দিকে আগাইয়া আবার সে কহিল—উপহার—

নিতাই কহিল,—থ্-থ্-থ্-থ্-আ-ক্।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তরুণী-সঙ্গ

গলিতে তখনও জল আছে। সেই জলেই নিতাই নামিয়া পড়িল,—কাঁধে বর্ষাতি-কোট ও গলায় চামড়ার থার্মো-ফ্লাস্ক ষ্ট্রাপে ঝুলিতেছে। কোঁচা মালকোঁচায় পরিণত, জুতা জোড়া হাতে লইতে পারিল না। হংসেশ্বর রোয়াকে দাঁড়াইয়া কহিল,—বাঁয়ে যান, একটু গেলেই ডাইনে একটা রাস্তা পাবেন। সেটা ধরে খানিক গেলেই আহিরীটোলা ষ্ট্রীট। ওদিকটায় জল বেশীক্ষণ জমে থাকে না।

হাসিয়া মাথা নাড়িয়া অভিবাদন জানাইয়া নিতাই হংসেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করিল।

এ-জলে কলিকাতায় পথ চলিতে গিয়া জুতা কাহারও কোনো দিনই বাঁচে নাই। নিতাইয়ের জুতাও বাঁচিল না; ভিজিয়া আমসত্ত্বের মত পায়ে লেপিয়া রহিল। একবার জলে ভিজিলে মানুষের রোখ চাপিয়া

যায়, ভয়-লজ্জা থাকে না, ভিজিবার স্পৃহাও প্রবল হয়, এটা মানুষের চিরদিনের আদিম সংস্কার। নিতাইও তাই তার ভিজা-জুতা-পায়ে জলের উপর দিয়া হাঁটিতে এতটুকু দ্বিধা রাখিল না।

নিমতলা ট্রাম-ডিপোয় পৌঁছিয়া বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর ট্রাম মিলিল। ট্রামে উঠিয়া সে নগদ পাঁচ পয়সা দিয়া টিকিট কিনিল। টিকিট কিনিয়া ঘড়ী খুলিয়া দেখে, পৌনে পাঁচটা। পথে আবার এক বিষম বিপদ! ট্রাম-লাইনের উপর পাট-বোঝাই মোষের গাড়ী চাকা ভাঙিয়া পড়িয়া আছে,—সেই পাট সরাইয়া পথ পরিষ্কার হইলে হাবড়ার পুলের কাছে আসিয়া ট্রাম পৌছিল। নিতাই দেখে, হ্যারিসন রোড হইতে একটা বাস পুলের দিকে চলিয়াছে। ট্রাম হইতে লাফাইয়া নামিয়া সে বাসের পিছনে ছুটিল। বাস দাঁড়াইল না,—মাঝে হইতে একটা ভারী লরী আসিয়া এমন কাদা ছিটাইয়া গেল যে, সে-কাদা নিতাইয়ের জামায়-কাপড়ে মুখে-চোখে লাগিয়া তাকে বিচিত্র ভূষায় বিভূষিত করিয়া দিল। বিরক্তি-ভরে আর বাসেব জন্য অপেক্ষা না করিয়া সে হাঁটিয়া পুল পার হইল। যখন ষ্টেশনে পৌছিল, তখন ছ'টা বাজিয়া গিয়াছে। একটু পরেই বর্দ্ধমান লোকাল। এখনও চেষ্টা করিলে বোধ হয় সে ট্রেণ ধরা যায়।

তাড়াতাড়ি প্লাটফর্ম্মে ঢুকিয়া সে লোকালের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার এক কোণ অধিকার করিয়া বসিল। বর্ষাতি কোট পাশে রাখিয়া ফ্লাস্কটা সে কামরার মধ্যে ঝুলাইয়া দিল। প্লাটফর্ম্মে ভিড বেশ, তবে তার কামরার দিকে কারো লক্ষ্য নাই। হাতে ঝাড়নে-বাঁধা বিবিধ তরকারী ও অন্য জিনিষ-পত্র লইয়া অফিস-ফেরত যাত্রীর দল ইণ্টার-ক্লাশ আর থার্ড-ক্লাশের কামরার দিকে ছুটিয়াছে; এ দুই ক্লাশে দাম শস্তা হয়, তা ছাড়া পরিচিত দলটি একসঙ্গে মিলিতে পায়।

ট্রেণ ছাড়িবার বাঁশী বাজিল। এমন সময় তার কামরার দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এক তরুণী। তরুণীর দেহ এমন ক্ষীণ যে, সহসা দেখিলে মনে হয়, বুঝি ভারতীয় চিত্র-কলার কল্পকুঞ্জ ছাড়িয়া ইনি শরীরিণী মূর্ত্তিতে রেল-রথে যাত্রাভিলাষিণী হইয়া উপস্থিত হইলেন! নিতাই তাঁকে দেখিয়া প্রথমটা চমকিত হইল। তার পর যখন তার চমক কাটিল, তরুণী তখন কামরার বেঞ্চে বসিয়াছেন এবং ট্রেণ চলিতে সুরু করিয়াছে। তরুণীর চোখে চশমা; পাশে একটা হাত-ব্যাগ; তার উপরে সাদা অক্ষরে লেখা আছে— Miss Pelava Roy. B. A. বেঞ্চের নীচে মিস্ পেলবা রায়ের একটা ছোট ষ্টীল-ট্রাঙ্ক এবং চামড়ায় বাঁধা ছোট একটি বিছানার বাণ্ডিল। মিস্ পেলবা রায় বি-এ কামরায় বসিয়া বেতের একটি ছোট ব্যাগ কোলের উপর রাখিয়া তার মধ্য হইতে একটা প্লেট এবং তৎসঙ্গে কাগজের একটা বগলি বাহির করিলেন। প্লেটটা বেঞ্চে রাখিয়া বগলি হইতে ক' স্লাইশ্ পাঁওরুটি, দুটো কলা, ক'টা সিদ্ধ আলু, মরিচের গুঁড়া, কাগজের প্যাকেটে মাখন ও দু'খানা কেক্ বাহির করিলেন এবং পরক্ষণে নিঃশব্দে সেগুলি খাইতে লাগিলেন।

নিতাই থাকিয়া-থাকিয়া তাঁর পানে অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁকে দেখিতে লাগিল।... লজ্জার আভাষ ক্ষণে ক্ষণে তাকে কণ্টকিত করিয়া তুলিতেছিল! সে ভাবিল, বিবাহ যদি করিতে হয় তো এমনি বিদুষী মহিলাকেই...কেমন সহজ, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী... বাজে বিশ্রী লজ্জার ছায়ামাত্র নাই! একা ট্রেণে চলিয়াছেন, মানুষের মতই—ভারী লগেজের মত পরের স্কন্ধে চড়িবার ধার ধারেন না! পায়ে জুতা, সাদা-সিধা শাড়ীই কেমন বিশিষ্ট ভঙ্গীতে সারা অবয়বখানিকে আবরিত রাখিয়াছে!.বি-এ পাশ!...কিন্তু কে এই মিস্ পেলবা রায় বি এ? কোথায় যাইতেছেন?

কেন যাইতেছেন? আলাপ করা যায় না?…পূর্ব্ব-পঠিত যত বিলাতী ম্যাগাজিনের রাশি-রাশি গল্প তার মগজটাকে ভারী জোরে নাড়া দিতে লাগিল…তার মনে হইল, এমন একটা বিপদ যদি ঘটে? একটা ভয়ঙ্কর কোলিশন্…? ট্রেণের যত যাত্রী সে-কোলিশনে মাথা ফাটিয়া মরিয়া যাইবে, নিতাই শুধু লাইনের পাশে পড়িয়া থাকিবে, আর তার বাহুর উপর দেহ-ভার-লুণ্ঠিতা…এই মিস্ পেলবা রায় বি-এ…! আঃ! এমনটি হইলে তার পরিণতির শুধু একটিমাত্র পথই আছে! সে পথ…

তার কল্পনার স্রোতে বাধা পড়িল। সহসা কামরার মধ্যে কোমল কণ্ঠে ধ্বনি ফুটিল,—ও, ডিয়ার, ডিযার, ডিয়ার…

ডিয়ার! এ কথার সাধারণ যে-অর্থ ছেলেবেলা হইতেই ডিক্সনারীর সাহায্যে নিতাই পাইয়াছে…পেলবা রায়ের দিকে নিতাই চাহিল। তাঁর মুখে বিরক্তি ও বেদনা—ব্যাপার কি?

পেলবা রায় চতুর্দ্দিকে হতাশভাবে চাহিলেন, কোলের উপর প্লেটে এক শ্লাইশ্ পাঁওরুটি ও অর্দ্ধাবশিষ্ট কদলী—তাঁর মুখের ভঙ্গী অত্যন্ত বেদনার্ত্ত!

নিতাই অস্থির হইয়া উঠিল। এই তো সুযোগ— কিন্তু এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে কণ্ঠে ভাষার প্রয়োজন! সে ভাষা ফুটানো তার পক্ষে যে কি দুরূহ ব্যাপার…

ট্রেণের গতি মন্থর হইল এবং পরক্ষণেই ট্রেণ থামিল। একটা ষ্টেশন। মুখ বাড়াইয়া নিতাই দেখে, উত্তরপাড়া! মিস্ পেলবা রায় উঠিয়া জানালার মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া প্লাটফর্ম্মে যত দূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া দেখিলেন, এবং নিজের মনেই বলিলেন—Not a drop of water!…উঁ!……

কথাটা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। ট্রেণ চলিল। নিতাই চাহিয়া দেখে, মিস্ পেলবা রায়ের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে !····· ঠিক, জল ··জল চাই ···· a kingdom for a drop of water.···একটা রাজ্য !···কে জানে, হয় তো স্থূল মাটীর রাজ্য নয়·· এই তরুণীর হৃদয়-রাজ্যই বা ·

কিন্তু তার যে কথা কহিবার শক্তি নাই ! লিখিয়া জানাইবে ? ···পকেটে পেন্সিল ছিল, আর হংসেশ্বর সাহাব সেই ক্যাস মেমো-লেখা কাগজের টুকরাটা · ···

কাগজ বাহির করিয়া সে লিখিল, I have got tea in my flask, madam. If you dont' mind..... এই অবধি লিখিয়া সে পেলবা রায়ের পানে চাহিল···তিনি তখন ছোট একটি রুমালে মুখ চাপিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন···বাতাসে তাঁর কেশগুচ্ছ উড়িয়া মুখে-চোখে পড়িতেছে ··চমৎকার ছবিখানি ! ভারতীয় চিত্রকলায় নিতাইয়ের অরুচি ছিল ; এ ছবি দেখিয়া সে-অরুচি কাটিয়া গেল !··· কবির কথাই ঠিক·· সঞ্চরিণী পল্লবিনী লতেব ··তন্বী দেহ-লতা। অর্থাৎ লতার মত তনু দেহই শুধু নারীকে সাজে !

কাগজের টুকরাটা মুড়িয়া হাতে লইয়া সে অতি সঙ্কোচে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চলন্ত ট্রেণের কামরায় মাতালের মত টলিতে টলিতে তরুণীর দিকে অগ্রসর হইল ; পরে যথাসম্ভব ব্যবধান রাখিয়া অত্যন্ত সবিনয় ভঙ্গীতে সে কহিল,—ম্ ম্ ম্ ম্ ম্—কথা আর কহিতে হইল না ! এক আর্ত্ত-ছন্দে সেই কথাটুকু ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল ! মিস্ পেলবা রায় চাহিয়া দেখিলেন, সাম্‌নেই সহযাত্রীর মুখের কি বিকট ভঙ্গী···তিনি ভীত হইলেন। নিতাই ততক্ষণে হাত বাড়াইয়া চিঠিটা তাঁর কোলের উপর ফেলিয়া দিয়াছে, ঠিক সেই অর্দ্ধাবশিষ্ট কদলীখণ্ডের পাশে।

মিস্ পেলবা রায় কাগজটা লইয়া অত্যন্ত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভরে বাহিরে ফেলিয়া দিলেন; এবং বিরক্তি-ঝাঁজালো স্বরে কহিলেন—No fuss, or I would pull cord.... তরুণী রুদ্র চোখে চাহিলেন—নিতাইয়ের কাদা-মাখা জামা, ঐ মুখ-ভঙ্গী..... ঐ স্বর..... নিতাই বুঝিল, কোথায় বাধিতেছে। বুঝিয়া সে ক্ষুব্ধ হইল। নিশ্বাস পড়িল। সর্ব্বনাশ! লাঞ্ছিত বেত্রাহত কুকুরের মত নিতাই আসিয়া আপনার জায়গায় বসিল। ট্রেণ চলিতে লাগিল।

নিতাই ভাবিল, বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক লিখিয়াছেন, কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে! হায় নারী! হায় যৌবন।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চলিয়া গেল... ..ট্রেণ মানকুণ্ড ছাড়াইল। নিতাই আবার তরুণীর পানে চাহিল—ভীষণ রমণীয় বলিয়া একটা কথা আছে, ঠিক তেমনি! দেখিবার মত বস্তু এই তরুণীর রূপ...... কিন্তু মুখের বচন যেন জলন্ত আগুন! তরুণ প্রাণের যত রঙীন কল্পনা ও-আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়!......

পেলবা রায় রুটিটুকু ততক্ষণে নিঃশেষ করিয়াছেন; তাঁর মুখে আবার সেই বেদনার আভাষ! নিতাই বুঝিল, জল চাই! যত কবিত্ব ঘিরিয়া থাক্ এই নারীকে—তবু শক্ত পাউরুটি খাইতে জল তাঁর পান করা চাই, না হইলে বুকে বাজিবে। এ প্রণয়ের বেদনা নয়, শারীরিক বেদনা—এর আঘাত প্রণয়-বেদনার চেয়েও গুরুতর! সাংঘাতিক হইতে পারে—প্রণয়-বেদনার সঙ্গে এইখানেই এ বেদনার পার্থক্য!

চির-যুগের তরুণ-চিত্ত রূপসী তরুণীর বেদনায় ভয়-অপমান ভুলিয়া যায়—যুগ-যুগ ধরিয়া এমনি ঘটিতেছে! আজ ট্রেণেও তাই ঘটিল। মিস্ পেলবা রায়ের বেদনা নিতাইয়ের বুকেও তীব্র বাজিল।

সে হাত বাড়াইয়া ফ্লাস্কটার দিকে চাহিয়া কহিল,—জ-জ জু জ-জল্ নয় —চ্-চ্ চা···

মিস্ পেলবা রায়ের চোখে তেমনি বিদ্যুতের বহ্নি! নিতাই হতাশ হইল।

চন্দননগর। পেলবা রায় প্লাটফর্মের চতুর্দ্দিকে আবার তাকাইলেন, হাঁকিলেন,—পানিপাঁড়ে—

বাহিরে ঝিল্লীর অবিরাম ধ্বনি···আর্ত্ত কোমল কণ্ঠের সে পানি-পাঁড়ে রব ·····সে ঝিল্লীধ্বনির মধ্যে বিরাম লইল।······

ট্রেণ চলিল।······কিন্তু আর পারা যায় না! পেলবা রায়ের ওই যাতনা-কাতর মুখ—তোৎলামির যাতনাও এমন তীব্র নিতাইয়ের প্রাণে জীবনে ইহার পূর্ব্বে আর কখনো বাজে নাই! যা হয় হোক! সে উঠিয়া ফ্লাস্কটা হাতে লইয়া আবার পেলবা রায়ের দিকে অগ্রসর হইল। বক্তব্যটুকু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়া সে কহিল—চ্-চ্-চ্-চা···

আবার! পেলবা রায় সবলে শূন্যে করাঘাত করিলেন—এবং সে আঘাত ফ্লাস্কে লাগিল। লাগিতেই ফ্লাস্কটা নিতাইয়ের হাত ফস্কাইয়া সজোরে গিয়া ঠেকিল ট্রেণের কামরার গায়ে। অমনি সশব্দে সেটা ফাটিয়া গেল—গরম চা উছলিয়া নিতাইয়ের গায়ে পড়িল···এবং কি প্রচণ্ড শব্দ! সে শব্দ শুনিয়া পেলবা রায় ভাবিলেন, বুঝি, একটা মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে! ইউনিভার্সিটির বি-এ-ডিগ্রীর ছাপ, স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বিচরণ প্রভৃতি সব ভুলিয়া তাঁর ভিতরকার বাঙালী নারীর নারীত্ব সভয়ে জাগিয়া উঠিল এবং এই বঙ্গ-রমণীত্ব জাগিয়া উঠিবামাত্র তিনি সবলে কামরার এ্যালার্ম কর্ড টানিয়া দিলেন···সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীত কণ্ঠস্বর ফুটিল—বোমা···!

এইটুকু মাত্র···কিন্তু আভাষ দিল প্রচুর!

গল্পে-কবিতায় পড়ি, পলক, নিমেষ !—সেই নিমেষ-পলকের মধ্যেই প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

নিতাই প্রথমটা নিশ্চেতন মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া ছিল। চেতনা ফিরিতে সে বাহিরে কলরব শুনিল। একটা মার-মার শব্দ…ও ছুটাছুটি—ট্রেণ তখন থামিয়া গিয়াছে ! নিতাই ভাবিল, যেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায়-পাতায় লেখা যতগুলো মুসলমান invasions,—সব একসঙ্গে ঘটিতে বসিয়াছে…মামুদ গজনী হইতে সুরু করিয়া নাদির শাহের দল অবধি সগর্জ্জনে ছুটিয়া আসিতেছে এই কামরার দিকে…এই কামরাটাই যেন কেন্দ্রীভূত উত্তর ভারত !…

বর্ষাতি কোট কাঁধে তুলিয়া কামরার দ্বার খুলিয়া সে প্রচণ্ড লম্ফে লাইনের ধারে ঝোপের মধ্যে পড়িল। পিছনে সেই কোলাহল —যেন ধূমকেতু আসিয়া পৃথিবীকে মহাশব্দে ধাক্কা দিয়াছে…!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আয়েষা ? না, তিলোত্তমা ?

দৌড়-দৌড়-দৌড়…সোজাসুজি উত্তর মুখে…জলে নামিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় সর্ব্বাঙ্গ ছড়িয়া বিঁধিয়া—কখনো পড়িয়া, কখনো বসিয়া …ডার্ব্বির ঘোড়াও বুঝি এমন বেগে দৌড়িতে পারে না !…ছেলেবেলায় নিতাই কথামালায় গল্প পড়িয়াছিল, খরগোশ আর কুকুরের দৌড়ের কথা ! সেই কথা মনে পড়িতেছিল। প্রাণের ভয়ে দৌড়ানো এক ব্যাপার, এবং আহারের সন্ধানে দৌড়ানো আর এক বস্তু ! দার্শনিকের

দচ বড় গলায় বলিয়া গিয়াছেন,—Struggle for existence. এ বুঝি তাই! ভীত কণ্ঠে একটি স্বর—'বোমা', সঙ্গে সঙ্গে এক দল লোকের ছুটিয়া আসা···শুধু তাই নয়, ট্রেণের কামরা, অ্যালাম সিগন্যালের টানে ট্রেণ থামা···এতগুলো ব্যাপারের মিলনের ফল সাংঘাতিক! পুরাণের অষ্টবজ্র-মিলনও তার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার!

ধানের ক্ষেত,···মাথার উপর মেঘ-ভাঙ্গা আকাশে চাঁদের আলো··· তরুণ সাহিত্যিকের পক্ষে পরম উপভোগের বস্তু! কিন্তু এ দৃশ্য উপভোগ করিতে হইলে মনটাকেও সেদিকে তৈয়ার রাখা চাই···ওই আকাশ, ওই ধানক্ষেতের দিকে নিতাইয়ের মনের লক্ষ্য মাত্র নাই— প্রাণটাকে কোনোমতে বাঁচাইয়া তুলিবে, সেই দিকেই লক্ষ্য! তার চোখে তখন ত্নুনিয়ার আলো নিবিয়া গিয়াছে···একটা আঁধার-কালো পর্দ্দার মধ্যে যেন সে লুটোপুটি খাইতেছে! এত ছুটিয়াও পা যেন তার দেহটাকে ঠিক টানিতে পারিতেছে না! তাই সে বেগে—আরো বেগে ছুটিতেছিল। ঝোপে-ঝাপে ব্যাঙ্ ডাকিতেছিল। কবিতায় দাদুরীর ডাক মাধুরীর সৃষ্টি করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রাণটাকে চম্কাইয়া দেয়!

তবু সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে! মানুষ চিরকাল দৌড়িতেও পারে না। অসীম জানিয়া জল-পথে প্রথম যে-দিন ভূপর্য্যটক পাড়ি দিয়াছিলেন, তিনিও যাত্রা-শেষে আসিয়া দেখেন, প্রথমে যেখান হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিলেন, আবার সেইখানেই তিনি পৌছিয়াছেন! যাত্রা থামিল। দিক্‌বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া বহু পথ অতিক্রমের পর নিতাই সহসা লক্ষ্য করিল, এক-ঝাড় কলাগাছ, তার পাশে একটা কুটীরের দ্বার এবং দ্বার-পথে আলোর একটা বিন্দু! পরমুহূর্ত্তেই ত্নুনিয়া কালো হইয়া গেল এবং সে ভূমে দেহ-ভার লুটাইয়া দিল।······

যখন চোখ চাহিল, তখন চোখের সামনে প্রথম উদয় হইল, একজোড়া কালো চোখ! কি উদ্বেগ সে দুই চোখে! নিতাই চক্ষু মুদিল, ভাবিল, সেই পেলবা রায় বি-এ! এতদূর অবধি তাঁর সেই চোখ তারি পিছনে তাড়া করিয়া আসিয়াছে? কিন্তু না, সে চোখে দম্ভ আর দর্পের অগ্নিশিখা···আর এ দুটি চোখে? মমতার অশ্রু, না?· আবার সে চোখ চাহিল, সেই দুই কালো চোখ!···সারা দুনিয়া যেন তার বেদনায় মমতা-ভরা এই দুই কালো চোখের করুণ দৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে! না·· ওই যে কালো ভ্রূ, ওই ললাট-তল, ওই কালো চুলের গোছা, আর তার নীচে ওই কম্প্র ওষ্ঠ·· ওই চিবুক · মমতা মাখা ওই একখানি কোমল মুখ! · এ ··?

নিতাই আবার চক্ষু মুদিল! স্বপ্ন · ? স্বপ্নে শশী ভট্‌চায্যির সেই মেয়ে পুঁটী···এ কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়ায়? স্বপ্নও তো নয় · ললাটে এই কোমল কর-স্পর্শ! চোখ খুলিয়া নিতাই দেখে, পুঁটীই! যে দুরন্ত মেয়ে তার গাছের ফুল পাড়িতেছিল, সে বকিতে তাকে ভ্যাংচাইয়াছিল···সেই পুঁটী! হাজার হোক, বালিকা হইলেও পুঁটী নারী! আর নারীব হৃদয় অপূর্ব্ব রহস্যে ভরা! সে-কাল হইতে কবি-মহাকবিরাও এই কথাই বলিয়া আসিতেছেন, সকল দেশে!···

পুঁটী ডাকিল,—মা ·

উত্তর হইল—কেন রে?

পুঁটী কহিল—দুধ জ্বাল্ হলো তোমার? আনো—চোখ চেয়েছে!

হোক স্বপ্ন—বড় মধুর স্বপ্ন! এ স্বপ্নের মধ্যে চির-নিদ্রাও ঢের আরামের! এমন স্বপ্ন দেখিলে কে সাধ করিয়া চোখ চাহিতে

চায়! সারা দুনিয়ায় কেবলি হিংসা, কেবলি বিদ্রূপ, আর দম্ভের মাতন চলিয়াছে, সে তো চোখ চাহিয়া তা দেখিয়াছে! তার চেয়ে এ ঘুমের স্বপ্ন-রাজ্য—এ তার স্বর্গ! নিতাই আবার চক্ষু মুদিল!

এমনি জাগা, আবার পরক্ষণে চক্ষু মোদা…চাহিয়া বেশীক্ষণ থাকাও যায় না…কে যেন জোর করিয়া চোখ দুটাকে মুদিয়া ধরে, এ স্বপ্ন…না, জাগা? ইহার মধ্যেই কাণে মাঝে মাঝে দুই-চারিটা কথা ভাসিয়া আসে, মুখে দুধও কে ঢালিয়া দেয়…

ভালো করিয়া নিতাই চোখ চাহিয়া দেখে, ঘরে সূর্য্যের আলো …এ আলো যেন কত শত বৎসর ধরিয়াই বিলুপ্ত ছিল! আজ আবার দেখা দিয়াছে!…কিন্তু এ কার ঘর? একটা জীর্ণ কুটীর। রাত্রির কথা মনে পড়িল, পাগলের মত সেই দিক্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছোটা, তার পর একটা আঘাত · সমস্ত পৃথিবী সে আঘাতে চূর্ণ হইয়া কোথায় যেন ছিট্‌কাইয়া পড়িল! একবার আলোর একটি বিন্দু, তার পরই অন্ধকারের বিরাট গভীর গহন-তল!…

সে উঠিয়া বসিল…বাহিরে খড়মের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে শশী ভট্টাচার্য্যের ভিতরে প্রবেশ। শশী ভট্টাচার্য্য গ্রামের পুরোহিত। শশী ভট্টাচার্য্য কহিলেন,—যে চোট লেগেছিল, সাংঘাতিক…তুমি যে আবার চোখ চাইবে বাবা, তা ভাবিনি!

চেতনা এখন ফিরিয়াছে। নিতাই কহিল,—হ্যাঁ—

বলিয়া সে বিস্মিত হইল—কথা কোথাও বাধিল না তো! সেই বটিকা? কিন্তু সে বটিকা সে স্পর্শও করে নাই। তবে?

নূতন রৌদ্র, নূতন জাগরণ,…তার মাঝে এ কি নূতন আনন্দ!… বিস্ময়ে সে বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। পুঁটী আসিল, তার হাতে দুধের বাটি। পুঁটী কহিল—দুধটুকু খাও, নিতাই-দা…

সারা দুনিয়ার চেহারাই বদ্‌লাইয়া গিয়াছে! সেই পুঁটী···সে-ও এমন মিষ্ট কথা কয়! নিতাই চাহিয়া দেখিল—পুঁটী স্নান করিয়াছে, একরাশ ভিজা চুল তার পিঠ বহিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে! হাতে তার দুধ নয়, অমৃতের পাত্র—বাঃ, এ যেন সে পুঁটী নয়!

নিতাই হাত তুলিয়া দুধের বাটি লইতে গেল, পারিল না···হাতে অত্যন্ত বেদনা। পুঁটী তাহা লক্ষ্য করিল। শশী ভট্টাচার্য্য কহিলেন—আমি আহ্নিকটা সেরে নি। শশী ভট্টাচার্য্য প্রস্থান করিলেন।

পুঁটী আগাইয়া আসিল, আসিয়া নিতাইয়ের মুখে দুধের বাটি ধরিল; নিতাই দুগ্ধ পান করিল। তার শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র সরস হইল। সে পুঁটীর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। কৃতজ্ঞতা? না, এ রঙীন নবজাগ্রত দুনিয়ার রঙের নেশার আবেশ···?

পুঁটী রাগ করিল না, দুধের পাত্র রাখিয়া নিতাইয়েব গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল—কি করে কাল অমন হলো, নিতাই-দা? সর্ব্বাঙ্গ কাদায় ভরা, গায়ে ছড়া-কাটা দাগ, কপালে চোট—পাগলের মত মূর্ত্তি? একটা শব্দ শুনে ছুটে গিয়ে দেখি, আমাদের চৌকাঠের উপর তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছো!

নিতাই হাসিল। সেই হাসির সঙ্গে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল,—হংসেশ্বর সাহা, জল-ভরা আহিরীটোলার গলি, ট্রেণেব কামরা, ভারতীয় চিত্র-কলার মডেল মিস্ শেলবা রায় বি এ! তার পর কড়-কড় শব্দে বাজ পড়িল, আর সেই সঙ্গে আকাশ ছাড়িয়া দৈত্যের দল হুহুঙ্কারে রেল-লাইনের ধারে ধানের ক্ষেতে লাফাইয়া নামিয়া কি হানাই দিল! নিতাই শিহরিয়া উঠিল।

পুঁটী কহিল,—ভাগ্যে আমাদের বাড়ীর চৌকাঠ! মাঠের মধ্যে কি গাছতলায় যদি পড়তে···! ভয়ে পুঁটীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল!

একটু থামিয়া পুঁটী নিতাইকে লক্ষ্য করিল। বেচারী—নেহাৎ বেচারী! আহা!

তার পর পুঁটী কহিল—বাবার কাছে আর্ণিকা ছিল, কালই খাইয়ে দেছে। আজ তুমি বাড়ী যেতে পাবে না। আগে সারো। তা তোমার বাড়ীতে কি খপর পাঠাবো?

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।...

আরো তিন-চার দিন বেদনাহত শরীর লইয়া এই গরিবের কুঁড়েয় নিতাইকে পড়িয়া থাকিতে হইল! বাড়ী যাইবার ইচ্ছাও ছিল না...এখানকার এই সেবা—প্রাণ তার আরামে বর্ত্তাইয়া গিয়াছিল!

পঞ্চম দিনের প্রভাতে গায়ের বেদনা কাটিলে নিতাই গৃহে ফিরিবার বাসনা জানাইল। পুঁটী কহিল,—চলো, আমি তোমায় রেখে আসি!

নিতাই পুঁটীর হাত ধরিল, কহিল—য-য-য দি না যাই?

পুঁটী কহিল—কথা কইতে তোমার আগেকার মত আর বাধচে না তো...বাবা বলছিল, হয় তো এই থেকে কথার আড় সেরে যাবে। একটু সেরেচে, না?

নিতাই কহিল—হ্যাঁ। ত্ ত্-তোমার হাতের স্-স্-সেবায়—

পুঁটী হাসিয়া কহিল,—তা হলে বাড়ী গেলে আবার কথা বাধ্‌বে?

নিতাই কহিল,—ব্-ব্-ব্-বাধবে।

পুঁটী কহিল,—তা হলে উপায়?

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আ-আ-আছে।

পুঁটী কহিল,—কি?

নিতাই কহিল,—ত্-ত্-ত্—তোমায় যেতে হবে।

পুঁটী কহিল,—তোমার বাড়ী? বা রে—তা বুঝি হয়?

নিতাই কহিল,—হয়। ত্-ত্-ত্ তোমার মাকে বলবো।

পুঁটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—কি বলবে?

নিতাই কহিল,—ব্-ব্-বিয়ের জন্যে · বলিয়াই সে পুঁটীর হাত ধরিয়া ফেলিল। বেশ জোরে। তার পর আবার কহিল—ক্-ক্-ক্-কনে খুঁজছিলুম আমি। ত্-ত্-ত্-তুমি—

পুঁটী নিতাইয়ের হাত ছাড়াইয়া সরিয়া আসিল, ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল,—আমি ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা-ভ্যাংচাবো…বলিয়াই সে হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল।

নিতাই কহিল,—ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা-ভ্যা-ভ্যাংচাও গে…আমি র্-র্-র্-রাগ করলে তো!

বাহির হইতে মা ডাকিলেন—পুঁটী ··

পুঁটী কহিল,—যাই মা·· পুঁটী চলিয়া গেল।

মায়ে-ঝীয়ে বাহিরে কি কথা হইল। তার পর মা আসিয়া কহিলেন,—এখনি যাবে বাবা? না খেয়ে?

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

মা কহিলেন,—তা হয় না বাবা। নেয়ে-খেয়ে যেয়ো! আর কোথাই-বা যাবে? আহা! এমন সোনার চাঁদ ছেলে বাড়ী-ছাড়া ক'দিন, তা এমন পোড়া পিশি, যে একটা খোঁজ-খপর নেই! আমিও খপর দিইনি। ভাবছিলুম, মাগীর রকমখানা দেখি। ঐ প্যালা ছোঁড়াটাও কি তেমনি…

এটা নিতাইয়ের বুকেও বাজিতেছিল…কেবলি মনে হইতেছিল,—সে কি ঘর যে সেখানে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইবে?

'মা বলিলেন,—বামনের চাঁদে হাত ··না হলে কত সাধই হয়…

এ কথার মর্ম্ম নিতাই বুঝিল। এই সুযোগ…কণ্ঠ-শিরাগুলাকে

স্ফীত বিপর্য্যস্ত করিয়া নিতাই প্রায় আধ ঘণ্টার কশরতে মাকে জানাইয়া দিল, পুঁটীকে যদি তার হাতে দিবার অমত না থাকে ইত্যাদি···

শুনিয়া আনন্দে মায়ের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল ··

নিতাইকে ভাত বাড়িয়া দিলে নিতাই খাইতে বসিল। পুঁটী দালানের একধারে গুড়িয়া-পুতুল লইয়া সংসার পাতিয়া বসিয়াছে। শশী ভট্টাচার্য্যকে পুঁটীর মা বলিতেছিলেন,—ভগবান এনে দেছেন · না হলে, বিপদে পড়ে কোথা থেকে ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটু সেবার জন্য বাছা আমার দোরেই বা এসে পড়বে কেন? একেই বলে গো প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

ঘটিল তাই···কিন্তু সে আরো চার-পাঁচ মাস পরে···অগ্রাণের গোড়ায়!

দাম্পত্য-কলহে চৈব

হেমন্ত 'ল' পাশ করিয়া আলিপুরে সদ্য ওকালতি সুরু করিয়াছে। টোপ বিস্তর ফেলিতেছে, তবে মক্কেল-রূপ মাছ এখনও গাঁথিতে পারে নাই। খিদিরপুরের কাছে ছোট একখানি বাংলা খরিদ করিয়া হাল ফ্যাশনে তাকে সাজাইয়াও তুলিতেছে। তরুণী বধূ শান্তি আসিয়া সে বাংলায় উঠিয়াছে—আজ তিন মাস। ওকালতিতে যা হইবার হইবে, তবে দু'জনে মিলিয়া জীবনের নানা কল্পনাকে যখন তরুণ-মনের রঙীন আলোয় বিচিত্র করিয়া তুলিতে বিভোর, তখন সহসা এক দিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি একটা তুচ্ছ বিষয় লইয়া প্রবল মান-অভিমানের পালা জাগিল। তার ফলে নির্ব্বাক্ হেমন্ত বেলা এগারোটায় চাপকান আঁটিয়া কোর্টে বাহির হইয়া গেল; এবং তার বাহির হইবার এক ঘণ্টা পরে আহারাদি সমাপন করিয়া শান্তিও বাড়ীর পুরানো ভৃত্য বংশীকে সঙ্গে লইয়া ট্যাক্সি ডাকাইয়া কাশীপুরে মাতামহ গোবিন্দচরণের গৃহে গিয়া উঠিল। শান্তিকে কাশীপুরে পৌছাইয়া বংশী আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল।

শান্তি মা-বাপ-মরা মেয়ে। মাতামহ গোবিন্দচরণের সে ভিন্ন সম্বলও আর কেহ নাই। তাই অতিরিক্ত আদরে শান্তির মেজাজটুকু খুব শান্ত হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তার গোঁ ছিল দুর্জ্জয় এবং সে গোঁ তিলমাত্র বিরুদ্ধ আঘাত পাইলে অচিরে বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা জাগাইয়া তোলে বিলক্ষণ, তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ অভিমানের

উদয় আজ এই প্রথম। কাজেই, তরুণ হেমন্ত অভিমানে মৌনী হইয়া যখন মক্কেলের সন্ধানে কাছারি ছুটিল, তখন গৃহাভ্যন্তরে এতখানি বিপ্লবের কল্পনা তার মনেও স্থান পায় নাই!

বৈকালে গৃহে ফিরিয়া গৃহের অবস্থা দেখিয়া এবং বংশীর কাছে রিপোর্ট শুনিয়া হেমন্ত রাগে গুম্ হইয়া রহিল; তার পর চা পান করিয়া বন্ধু-মজলিসে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল রাত দশটার পরে। সে ভাবিয়াছিল, শান্তি এতক্ষণে নিজের কৃত-কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়াছে নিশ্চয়! কিন্তু ফিরিয়া যখন সে দেখিল, শান্তি ফিরিয়া আসে নাই, তখন ক্ষুব্ধ অভিমান তীব্র রোষের প্রদীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল এবং সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এত স্পর্দ্ধা! কি এমন বলিয়াছি যে, শান্তি…থাক্ সে সেখানে বুড়া মাতামহের আদরে নিশ্চিন্ত আরামে! আমার কি আর, ইত্যাদি!

কিন্তু প্রতিজ্ঞা যত দুর্জ্জয় হউক, মন যে তার আড়ালে কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে চায় না! বালা খরিদ করিয়া তাকে সাজাইবার কল্পনা যে-দিন শান্তির সহানুভূতির পরশ পাইয়া বিচিত্র রঙে রঙীন হইয়া উঠিল, সে-দিন সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, তার জীবনের আকাশে এমন আঁধার ঘনাইতে পারে! এই শান্তি—ক্ষুদ্র একটু কথার আঘাত এমন বড় হইল যে, এতখানি ভালবাসা তার কাছে আমোল পাইল না! হায় রে, জীবনের সব কাঁটা রঙীন ফুল হইয়া চোখের সাম্‌নে জাগিয়া উঠিয়াছে ভাবিয়া সে ফুল বুকে তুলিতে যেমন উদ্যত হইল, অমনি কোথায় মিলাইয়া গেল ফুলের সে কোমল রঙীন দল… কাঁটার আঘাতে বুক তার ছিঁড়িয়া যাইবার যো …..

বাহিরে এক-আকাশ জ্যোৎস্না…সারা পৃথিবী তার পরশে বিভোর বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে।…এ জ্যোৎস্না কি তার এমনি বেদনায়

কাটাইবার কথা! কিন্তু···তার সমস্ত অন্তরাত্মা নিষ্ফলতার ব্যথায় আকুল দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়া উঠিল।

পরের দিন। কোনো কাজে মন লাগে না! সারা দুনিয়া যেন একটা রাত্রির মধ্যেই জড় পাষাণে পরিণত হইয়া গিয়াছে! ঐ গাছের ফুল, ঐ সবুজ ফার্ণ, খাঁচার মধ্যে ঐ ক্যানারি পাখী—ও-গুলা যেন শোলার তৈরী, প্রাণহীন, নেহাৎ কৃত্রিম! বংশী চায়ের পেয়ালা দিয়া গেল। টেব্‌লের উপর খপরের কাগজখানা পড়িয়া রহিয়াছে। অন্য দিন চায়ের পেয়ালা আর খপরের কাগজের মধ্যে কতখানি কাব্য ঝরিয়া পড়ে, আজ ওখানা শুধু বাজ্যের বাজে খপর-ভরা একটা নির্জীব কাগজমাত্র, আর ঐ চায়ের পেয়ালা···ও চায়ে না আছে রস, না আছে স্বাদ!

সাধনার ধন এক মক্কেলকে লইয়া মুহুরী আসিয়া দেখা দিল। হেমন্ত কহিল,—কাল এসো, শরীর আজ ভালো নয়।

মুহুরী সবিনয়ে জানাইল, কাল অবধি অপেক্ষা করিতে গেলে ইহাকে কি আর ফিরাইয়া আনা যাইবে? আশে-পাশে সংখ্যাহীন তৃষিত বাহুর উদ্যত আহ্বান···

হেমন্ত কহিল,—নিরুপায়!

মুহুরীও নিরুপায়তার নিশ্বাস ফেলিয়া মক্কেলকে লইয়া বিদায় লইল।

বংশী আসিয়া কহিল,—বৌমা নেই। বাজারের পয়সা···

হেমন্ত কহিল,—যা-খুসী আন্ গে, পয়সা পরে নিস্।···

সরস বিশ্ব একেবারেই বিরস তিক্ত! কোথায় এর মোহ, কিম্বা আকর্ষণ!···বেদনার ফাট ধরিয়া মনটা দু' ভাগ হইয়া দু'দিকে সরিয়া গিয়াছে। একটা দিক কাতর নিশ্বাসে ডাকিতেছে,—প্রিয়া, প্রিয়া, অপর দিক আক্রোশে জ্বলিয়া হুঙ্কার তুলিতেছে—খবর্দ্দার, খবর্দ্দার!

বেলা বাড়িতে লাগিল। বংশী আসিয়া তাগিদ দিয়া গেল—দশটা বাজে···

বাজুক! কা'র কি আসিয়া যায়! অন্য দিন এমন সময় স্নে খাওয়া সারিয়া কাছারির পোষাক পরিবার উদ্যোগ করে, তার মধ্যে বিশ্বের কি আরাম! শান্তির চুড়িগুলায় কি রাগিণীই বাজিতে থাকে··· তার সে কি যত্ন, কি আদর!

আজ·· সে-সব যেন স্বপ্ন!

বারোটার সময় হঠাৎ কি খেয়াল মনে জাগিল। কাছারির পোষাক আঁটিয়া হেমন্ত বাহির হইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে যেন কোথা হইতে একটা চেতনা জাগিল—মক্কেল! মক্কেল!

মুহুরী আসিয়া জানাইল,—সে মক্কেলটাকে রাখতে পারলুম না—কেশববাবুর কাছে গেল! দালালের দল, জানেন তো···

হেমন্ত কহিল,—যাক্, কুছ্ পরোয়া নেই!

ভালো লাগে না, কিছুই যে ভালো লাগে না! শান্তি—সব শান্তি সে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে!···তার বিস্ময় লাগিতেছিল যে, দু'দিন আগে কোথায় ছিল শান্তি···আর দু'দিন আসিয়া এমন দোর্দ্দণ্ড অমোঘ প্রভাবে হেমন্তকে এমন করিয়া দিয়াছে যে, আজ তার অস্তিত্বও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনকে আর ধরিয়া রাখা গেল না। সাজ-সজ্জা করিয়া হেমন্তকে ছুটিতে হইল—সেই অকরুণ প্রিয়ার উদ্দেশে।

হা রে, দুর্ব্বল ভীরু···মিনতির পাত্র লইয়া···

মন আবার বলিল, না, তার স্পর্দ্ধার একবার বোঝাপড়া করা প্রয়োজন।

সমস্ত বাংলা-বাড়ীখানা পিছনে বিদ্রূপে ফাটিয়া যেন অট্টহাস্ত করিয়া উঠিল! হেমন্ত সে-দিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

২

কাশীপুরের বাড়ীতে মাতামহ বিস্মিত হইয়া নাতিনীকে প্রশ্ন করিলেন,—তুই যে চলে এলি রে হঠাৎ। হেম পাঠালে?

শান্তি কহিল,—পাঠায়নি, আমি নিজেই চলে এলুম।

গোবিন্দচরণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দুই দিন পূর্ব্বে ও-বাড়ীর গৃহিণীর কি একটা ব্রত-উপলক্ষে দু'জন ব্রাহ্মণভোজনের ব্যাপারে মাতামহ খিদিরপুরে গিয়াছিলেন—নাতিনীটিকে এক রাত্রির জন্য আনিতে। তাঁদের একান্ত পীড়াপীড়ি। তা শান্তি আসে নাই। বলিয়াছিল,—যাবার উপায় নেই দাদু, নতুন ঘরদোর, লোকজনগুলো সঙ, সব গোলমাল করে দেবে। আর আজ সেই শান্তি হুম্ করিয়া নিজে হইতে আসিয়া হাজির বাড়ীর নূতনত্ব বা লোকজনের বুদ্ধিশুদ্ধিও এ দু'দিনে তো ঘোচে নাই।

শান্তি কহিল,—সংসার কি বিশ্রী, দাদু·· তার চেয়ে বেশ আছেন ঐ রামকৃষ্ণ মিশনের মেয়েরা। কেমন রোগীর সেবা, পরোপকার, ব্রত-ধর্ম্ম নিয়ে · বিয়ে না দিয়ে আমায় যদি রামকৃষ্ণ মিশনের কাজে যেতে দিতে··

গোবিন্দচরণের বিস্ময়ের মাত্রা সীমা ছাপিয়া উঠিল। বেচারা বৃদ্ধ। হালের বাঙ্লা উপন্যাস তো তিনি পড়েন নাই। কাজেই, কি করিয়া বুঝিবেন—শান্তির কথাগুলা সেই-সব উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ হইতে ধার করা।

তিনি কহিলেন,—হেমের সঙ্গে ঝগড়া হয়েচে, বুঝি? বৃদ্ধ হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—তা ঘর করুতে গেলে স্বামী-স্ত্রীতে অমন মান-অভিমান কত হয়! আমাদেরই কি হতো না?

বৃদ্ধের চোখের সামনে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার কত দৃশ্য যে চকিতে জাগিয়া উঠিল···প্রাণটা অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হইয়া আসিল। চল্লিশ বৎসর পরে আজও তরুণ-তরুণীর প্রাণ ঠিক তেমনি আছে! মান-অভিমানের তেমনি দোলায় দুলিয়া শিশুর মত প্রেম অনুরাগ মায়া-প্রীতি তেমনি ক্রমে বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু হেমন্ত তো ভারী শান্ত ছেলে! শান্তির গোঁ···ঠিক! তিনি তো জানেন, তাঁর নাতিনীটির মেজাজ কেমন!

শান্তি কহিল,—হাঁ, হাসপাতালে নার্শের কাজ করবো আমি দাদু, সংসার করা আমার পোষাবে না। পরের এস্তাজারি···

বৃদ্ধ আবার হাসিলেন; হাসিলেও বুকের মধ্যে একটা আশঙ্কার উদ্বেগ কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। এ-সব বলে কি শান্তি! ভদ্র ঘরের মেয়েও নাকি আবার হাসপাতালে কখনো—

তিনি কহিলেন,—ভাবিস্‌নে দিদি,—ভাখ্‌ না, হেম ও-বেলায় এসে সেধে কেঁদে আবার তোকে মাথায় করে নিয়ে যাবে'খন।

শান্তি কহিল,—সাধলে কাঁদলেই আমি অমনি যাচ্ছি কি না! বয়ে গেছে আমার যেতে!

না, এ প্রসঙ্গ ঠিক নয়!

বৃদ্ধ কহিলেন,—গঙ্গার ধারে আমাদের সেই বাগান কেমন হয়েচে, দেখিস্‌নি তো? চ' এক দিন সেখানে গিয়ে বন-ভোজন করে আসি সব—সামনের রবিবারে হেমেরও কাছারি নেই, বেশ হবে।

শান্তি কহিল,—আমি যাবো না।

বলিয়া সে উঠিয়া গেল। অন্দরের উঠানে বামুন-দির সঙ্গে দেখা। শান্তি কহিল,—আমায় একটু জলপাইয়ের আচার দাও না ভাই বামুন-দি। হাতে কাজ নেই, ওপরের ঘরে বসে বসে আচার খাই গে—

বামুন-দি কহিল,—শুধু আচার! দু'খানা লুচি ভেজে দি না?

—না, শুধু আচারই খাবো।

—দি দিদি···

—ওপরে এসে দিয়ে যাও ভাই লক্ষ্মীটি···বলিয়া শান্তি দোতলায় চলিয়া গেল।

খোলা জানালার মধ্য দিয়া একটা বস্তীর অভ্যন্তর দেখা যাইতেছিল। একটি বধূ দাওয়ায় ঝাঁট-পাট দিতেছে, মাথায় ঘোমটা। ঝাঁট-পাট শেষ হইলে বাঁশে-দোলানো একখানা ময়লা ধুতি টানিয়া পাড়িয়া দাওয়ায় উঠিয়া সেখানা সে কোঁচাইতে লাগিল। ওর স্বামীর ধুতি, নিশ্চয়! স্বামী? কাজে বাহির হইয়াছে, বধূ ঘরের কাজ-কর্ম্ম সারিতেছে। শান্তির বুকের এক কোণে ছোট একটু বেদনার ঘা বাজিল। ঐ তুচ্ছ কাজটুকুর মধ্যে বধূ তার প্রাণ যেন ঢালিয়া দিয়াছে, নিঃশেষে! উহাদের মধ্যে মান-অভিমানের বালাই বুঝি ঘটে না! কেন ঘটিবে? ছোট্ট গণ্ডী, কাজেই তর্ক কম। তর্ক হইতেই না মনের যত গোল! আর এ-তর্কের মূলে বিদ্যা-বুদ্ধির বড়াই আর আস্ফালন! অভিমান কেন না হইবে? না হয় একটু তর্ক তুলিয়া সে সরিয়াই গিয়াছিল, তা বলিয়া কথা বন্ধ করিয়া কাছারি চলিয়া গেলে! খাইতে গেলে, তা একবার ডাকিতেও পারিলে না? রাগ! তার যদি তেমন রাগ হইবে তো তাড়াতাড়ি পাণ সাজিয়া তাহাতে এসেন্সের খোসবু মিশাইয়া দিতে যাইবে কেন? একটু অভিমান! তোমার দম্ভ এত বড় হইল যে, ফিরিয়া ছোট একটু ডাক, তাও

ডাকিতে পারিলে না। পোষাক আঁটিয়া গম্ভীর মৌন মূর্ত্তিতে কাছারি বাহির হইয়া গেলে! এ-বয়সে স্বামীর কাছে অভিমান করিয়া একটু সোহাগ যদি না পাইল, তো কাজ কি তার সেখানে পড়িয়া হেনস্থা সহা!—এখনও জীবনের সব ক'টি বয়স পড়িয়া আছে। যখন খুব পুরানো হইয়া যাইবে? একটু অভিমানে হয়তো তখন বজ্রপাত ঘটিয়া যাইবে! কাজ কি তবে··· মানে-মানে তাই সে এখানে সরিয়া আসিয়াছে! একলা ওই দুর্জ্জয় মান লইয়া কত দিন থাকিতে পারো, থাকো!

মনের কোণে কোন্ গোপন গহনের মাঝ হইতে ছোট একটা পাখী কেবলই তবু গাহিতেছিল— আজই, আজই গো, আজই! দিনের আলো যখন নিবিয়া আসিবে, তখন—তখন ওগো তরুণী বধূ, তোমার জয়ের উল্লাসে আকাশ-বাতাস মাতিয়া উঠিবে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! এ যদি না হয়, তবে বৃথা তোমার যৌবনের তুলিতে লেখা অঙ্গে-অঙ্গে ওই লাবণ্যের বাহার!

সন্ধ্যায় ক্ষণে ক্ষণে শান্তির বুক দুলিয়া উঠিতেছিল—ওই বুঝি বাহিরে সেই পরিচিত স্বর! ওই না একটা ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল! ওই বুঝি দাদু মহা-উল্লাসে ডাক দিয়া বলেন,—ওরে কে এসেচে, ছাখ্। কিন্তু কোথায় কি! সন্ধ্যা গড়াইয়া রাত্রির কোলে আপনাকে নিক্ষেপ করিল, তবু সে পরিচিত স্বর ভাসিল না— কেহ আসিল না!···

পরের দিনটা—সারাদিন কি দুর্গ্রহের ভোগ ভুগিয়াই যে কাটিল! এমন করিয়া নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িয়া থাকাও যায় না তো! উপায় কি? অথচ নিজে সাধিয়া অত-বড় পরাজয়ও মাথা পাতিয়া লইতে পারে না! বুক যদি ভাঙিয়া যায়, যাক্! মুখকে তা বলিয়া কিছুতেই সে ফুটিতে দিবে না!···

বেদনায় ফুলিয়া অভিমান শেষে রোষের বহ্নিদাহে জ্বলিয়া উঠিল। শান্তি গিয়া সন্ধ্যার সময় বামুন-দির কাছে হাজির। সে নিজে আজ দাদুর জন্য তাঁর তরকারী রাঁধিয়া দিবে। বামুন-দি কহিল—এমন পাগলও দেখিনি। এ যে তোমার অনাসৃষ্টি আবদার, দিদিমণি। আগুন-তাতে ··

শান্তি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, বলিল,—ননীর শরীর, গলে যাবে! না?

গোবিন্দচরণ আসিয়া কহিলেন,—শান্তি, কি অশান্তির সৃষ্টি করচিস্ দিদি? হেম এসেচে।···

শান্তির সমস্ত বুকখানা জয়ের উল্লাসে যেন ফাটিয়া পড়িবে, এমনি ভাব·· সে জোর করিয়া বুকের সে উল্লাস দাবিয়া রাখিয়া ডাকিল,—দাদু!—ডাকিয়াই সে বাহিরে আসিল।

দাদু কহিলেন,—নাতজামাই এসেচে যে রে—বাইরে বসে আছে।

শান্তি কহিল,—কেন? তার স্বর শান্ত, উত্তেজনার চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই!

গোবিন্দচরণ দ্বিধা-ভরে নাতিনীর পানে চাহিলেন। শান্তি কহিল,—বাড়ী যেতে বলো। আমার সঙ্গে দেখা হবে না। আমি বিধু মামার বাড়ী যাচ্ছি।

শান্তি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন—শোন্ দিদি—

শান্তি কহিল—শোন্‌বার কিছু নেই। নাত-জামাই নিয়ে যদি আমোদ করা তোমার ইচ্ছা থাকে তো করতে পারো। আমি আজ বিধু মামার বাড়ীতেই রাত্তিরে থাকবো—মামীমার কাছে খাবো—মামীমা বেশ চাটনি রাঁধেন।

গোবিন্দচরণ বিপদে পড়িলেন। ও দিকে নাতজামাই, এ দিকে নাতনীর ভালো-করিয়া-জানা দুর্জ্জয় গোঁ! মারীচ-কুরঙ্গ বেচারাও বুঝি রামায়ণের যুগে এমন বিপদে পড়ে নাই!

শান্তি দাঁড়াইল না। গোবিন্দচরণ অগত্যা বাহিরের ঘরে আসিয়া নাতজামাইয়ের খাতিরে মনোযোগ দিলেন।

হেমন্ত কহিল,—ট্যাক্সিটা রেখেচি···আমি, মানে, শান্তিকে এখনি নিয়ে যাবো।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—সে কি হয় দাদা? এসেচো, কত আদরের জিনিষ তুমি—আজ থাকো। থেকে কাল সকালে খাওয়া-দাওয়া করে যেয়ো।

হেমন্ত বলিল,—আজ্ঞে না, কাল কাছারি আছে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—এখান থেকেই কাছারি করো। সকাল সকাল পাঠিয়ে দেবো।

হেমন্ত কহিল,—মাপ করুন, দাদামশায়, সে আর এক দিন এসে থাকবো। মানে, বাড়ী তেমন বন্ধ করে আসিনি···নতুন জায়গা! আমি শান্তির সঙ্গে দেখা করে তাকে বলি, চটপট গুছিয়ে নিতে।

আশঙ্কায় গোবিন্দচরণের গায়ে কাঁটা দিল! কে জানে, যে মেয়ে! যেন চেঙ্গিস্ খাঁ! এতক্ষণে বিধুর ওখানে না গিয়া থাকিলে, সাক্ষাৎটা যদি—

হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি জাগিল। তিনি কহিলেন,—শান্তি বিধুর ওখানে গেছে। রাত্রে তারা খাবার নেমন্তন্ন করেচে কি না···

হেমন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এ কথার পর কি করিবে, ভাবিতে-ছিল, হঠাৎ অন্দরের দিক হইতে পরিচিত স্বর শুনিল—আমি বিধু মামার বাড়ী চললুম, বামুন-দি। তোমাদের বাড়ীর ঝামেলা মিটলে খপর দিয়ো, আস্‌বো। দাদুকে বলো, ভাই—

হেমন্ত অবাক্! গোবিন্দচরণ ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়! জামাই মানুষ, —তাই তো! মেয়েটা এই গোঁয়ের জন্য নিজের কি সর্ব্বনাশ যে করিয়া বসিবে···

হেমন্ত তক্তাপোষের উপর বসিয়া পড়িয়া পরক্ষণে কহিল,—দাদামশায়!

সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখিয়া গোবিন্দচরণ ডাকিলেন,—দাদু!

হেমন্ত কহিল,—শান্তি আমার সঙ্গে দেখা করবে না, বুঝি?

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—ভারী একগুঁয়ে মেয়ে, দাদা—তাই তো বল্‌ছিলুম, আজ রাত্তিরটা থাকো। আমি সব ঠিক করে দেবো।

পুরুষত্বের অভিমান তাহাকে যেন চাবুক মারিল! হেমন্ত কহিল, —কিন্তু আমি তো কোনো অন্যায় করিনি, দাদামশায়!—তার চোখ ছলছলিয়া উঠিল।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—বড্ড আদর পেয়ে এসেচে—ছেলেমানুষ—ক্রমেই শুধরে যাবে, দাদা।

গোবিন্দচরণ হেমন্তর পাশে বসিলেন। দু-জনেই চুপ। ঘড়ির পেণ্ডুলামটা শুধু কাঠের ছোট কুঠরীর দেওয়ালে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া একঘেয়ে আর্ত্তনাদ তুলিতে লাগিল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে গোবিন্দচরণ ডাকিলেন—সত্য!

ভৃত্য সত্য সে আহ্বানে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন,—দিদিমণি বাড়ী আছে কি না, দেখে আয় তো।

সত্য চলিয়া গেল এবং পাঁচ মিনিট পরে আসিয়া খবর দিল, দিদিমণি একটু পূর্ব্বে ও-বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন—কাদি ঝি সঙ্গে গিয়াছে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—আচ্ছা, তুই যা—মোদ্দা বাড়ীতে বল্ গে যা, জামাইবাবু এসেচেন।

সত্য চলিয়া গেল! তার পরে আবার সেই নিস্তব্ধতা!

৩

হেমন্তকে বিস্তর মিনতিতে বুঝাইয়া পড়াইয়া গোবিন্দচরণ অন্দরে আসিয়াছিলেন। হেমন্ত ইতিমধ্যে প্রায় সাতবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছে—তা হলে আজ চল্লুম,—আর গোবিন্দচরণ বার বার তার হাত ধরিয়া—কি করচো দাদা? ছি! বলিয়া তাকে বসাইয়াছেন। প্রতিপদে আজ তাঁর স্বর্গগতা গৃহিণীর কথা মনে পড়িতেছিল। এ-সব কোমল বৃত্তির ব্যাধি, এর চিকিৎসা করা কি তাঁর কাজ! গৃহিণী যদি আজ থাকিতেন!

শান্তি রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়াছিল; বিধু মামার বাড়ীতে ভালো লাগিল না। এখানে এত বড় হৃদয়-নাটকের অভিনয়—এ ছাড়িয়া দূরে থাকিবার সাধ্য তার ছিল না!

গোবিন্দচরণ তাকে দেখিয়া ডাকিয়া বাহিরে আনিলেন, লোকজন যেন মান-অভিমানের এ ব্যাপারটা জানিতে না পারে! একটু খুসী-মনে তিনি কহিলেন,—তা হলে সুবুদ্ধি হয়েচে, দিদি!

শান্তি ঝাঁজিয়া উঠিল,—সুবুদ্ধিও নয়, কুবুদ্ধিও নয়! মামীমার শরীর ভালো নয়, তার ওপর কে কুটুম এসেচে—তাই চলে এলুম।

বৃদ্ধ হাসিলেন,—মৃদু হাসি! হায় রে, যৌবনের আড়ালে বসিয়া তোরা ভাবিস্, বুড়া কিছু বোঝে না! কিন্তু বুড়োদেরও একদিন যৌবন ছিল, এই কথাটা তোরা খেয়াল করিস্ না!

বৃদ্ধ কহিলেন,—লক্ষ্মী দিদিমণিটি, রাগ করিস্ নে—আমার মাথা কাটা যাবে—বুড়োর খাতিরে অন্ততঃ...

শান্তি কহিল,—তোমার বে-খাতির তো করচি না। বল্লো না, কি চাই?

বৃদ্ধ কহিলেন,—হেমকে ডেকে আনি, উপরে যা—মিটিয়ে ফ্যাল্।

শান্তি কহিল,—কি ? হয়েচে কি, যে, তা মেটাতে হবে ?

বৃদ্ধ কহিলেন,—তোদের যে মানের পালা চলেছে।

শান্তি কহিল,—মান আবার কিসের! কিছুই হয় নি, আমার কারো সঙ্গ ভালো লাগে না, আমি একলা থাকতে চাই।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—এই তো ছলনা করচো দিদি! তা, বোধ হয়, সে থাকবে না, একবারটি দেখা করবে। সত্যি, ও এই বুড়ো দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে খিদিরপুর থেকে কাশীপুর—এতটা পথ ট্যাক্সি ভাড়া করে আসেনি···বৃদ্ধ সস্নেহে শান্তির দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন।

শান্তি কহিল,—আমি দেখা করতে পারবো না—আমার মাথা ধরেচে বড্ড। ছাড়ো।

বৃদ্ধ কহিলেন,—একবারটি দেখা করো, দিদি!

শান্তি কহিল,—দেখা করতে আমি পারবো না, আমার ইচ্ছে নেই! ফের যদি দেখা করার জন্য পেড়াপেড়ি করো, তা হলে কাপড়ে কেরাসিন জ্বেলে এখনি আমি পুড়ে মরবো।

সর্ব্বনাশ! বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন! শান্তি এ বলে কি! তিনি যেন আর নাই, এমনি ভাব! এতখানি বয়স হইয়াছে, পৃথিবীর অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, অনেক সহিয়াছেনও—কিন্তু এমন বিপদ? নাঃ!

তিনি বিরক্ত হইলেন, কহিলেন,—কি যে নেই-আঁকড়ে গোঁ তোর দিদি! আমি কিছু ভালো বুঝচি না। এর ফলে কি যে হবে! নিজের মর্ম্মে বকিতে বকিতে তিনি বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

আসিবামাত্র হেমন্ত তাঁর মুখের পানে চাহিল। তিনি কহিলেন, —তার ভারি মাথা ধরেচে, তাই তো, তা দাদা,…

হেমন্ত বুঝিল, বুঝিয়া তার রাগও ধরিল। এত অভিমান,…কেন? কেন, কেন? বাড়ী বহিয়া সাধিতে আসিয়াছি, তা একবার দেখা করারও…তবু সে স্বামী! বাহিরের সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যে, সে-ও যে এ-কথায় একবার দেখা করিত…না, কিসের মায়া, কিসের মমতা, কিসেরই বা প্রেম? এ প্রেম সে দুই পায়ে চাপিয়া মাড়াইয়া গুঁড়া করিয়া দিবে! সে উঠিল, বলিল, –তা হলে আমি আসি দাদামশায়, রাত হয়ে যাচ্ছে।

গোবিন্দচরণ আবেগে তার দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন। নিরুপায় আর্দ্র কণ্ঠে কহিলেন,—রাগ করো না দাদা। ছেলেমানুষ, বড় বেশী আদর পেয়েচে কি না,…তা, কাল আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজে তাকে তোমার ওখানে পৌছে দিয়ে আসবো! মেয়েমানুষের এ অভিমান যে সর্ব্বনেশে! তা, দাদা,—

—না—না, রাগ কিসের? রাগ মোটেই নয়! বলিয়া হেমন্ত জোর করিয়া মুখে হাসি আনিল। এ যেন অক্ষম অভিনেতার শিক্ষকের তাড়নায় একটা কৃত্রিম হাসির চেষ্টা মাত্র!

হাসিয়া হেমন্ত চটপট বিদায় লইয়া ট্যাক্সিতে গিয়া চাপিল। ট্যাক্সিওয়ালাটা তখনও পর্য্যন্ত আকুল প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল—বাবু যদি ফেরেন! ড্রাইভার হিন্দু, হরির লুট মানে নাই তো? নহিলে এমন জ্যোৎস্না রাতে এ বয়সে হেমন্তর কি এখান হইতে ফিরিবার কথা! অদৃষ্ট!

বেদনা-শোক সহিয়া সহিয়া গোবিন্দচরণের বুকখানা পাথর হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু তাই যদি, তবে বুক এখনো

এমন কাঁপে কেন? তিনি হতভম্বের মত কাছের সোফাখানায় বসিয়া পড়িলেন। যেন এখনি কি এক মহাপ্রলয় বাধিয়া পৃথিবীটাকে চৌচির করিয়া ফেলিবে, এমনি আশঙ্কা তাঁর মনে জাগিতেছিল!

শান্তি আসিয়া ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকিল, এবং সতেজে কহিল, —বাবু নবাব! বুড়ো মানুষকে অপমান করে চলে যাওয়া হলো! কেন, আমার সঙ্গে দেখা হলো না তো। তাতে কি···তুমি বুঝি কেউ নও! তোমারো ঠিক হয়েচে—নাতজামাই নাতজামাই করে যেমন সাধতে গিয়েছিলে, তেমনি···

গোবিন্দচরণ অবাক্! চোখদুটাকে তিনি বিস্ফারিত করিয়া শান্তির পানে চাহিয়া রহিলেন।

শান্তি কহিল,—এসো দাদু· নাতজামাই, নাতজামাই! জানো না তো নাতজামাইয়ের মেজাজ! পুরুষ মানুষ বলে তেজ ছাখো না ·

গোবিন্দচরণ এবার কথা কহিলেন। কাশিয়া জোর করিয়া গলাটাকে সাফ করিয়া তিনি কহিলেন,—কেন, তেজ আবার তার কোন্‌খানটায়! তেজ তোরি। তুই একবার দেখা করতে পারলি না? ছি ভাই! ··তিনি চুপ করিলেন।

শান্তি কোন জবাব দিল না; সে তক্তাপোষে বসিয়া ভাবিতেছিল, তাই তো, এত শীঘ্র চলিয়া গেল! অভিমানের তীব্র একরাশ তীর নিক্ষেপ·করিয়া সে যে হেমন্তকে আরো কাবু করিয়া দিবে, ভাবিয়াছিল! তা···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—যা-ই বলিস্ দিদি, ভালো করলি না—রাগ করে যদি আর না আসে? যদি আর একটা বিয়ে করে বসে রাগের মাথায়? পুরুষমানুষ···বাধাও তো কিছু নেই···

এ কথায় শান্তি জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—পুরুষমানুষ তো মাথা কিনেচেন! ওঃ, বিয়ে করবেন! করুক না! কে বারণ করেচে! আমার তো বয়ে গেল! অত গোরা মেজাজ আমার সহ্য হবে না, তা বাপু, আমি বলে রাখচি!

গোবিন্দচরণ উদ্বিগ্নভাবে কহিলেন,—যদি বিয়েই করে? এমন তো ঘটেও…

শান্তি কহিল,—কেন ভাবচো দাদু? করুক না বিয়ে—আমি হাসপাতালে নার্শগিরি করবো…রোগীর সেবা, পরের উপকার, তা ছাড়া চরকা কিনে সুতো কাটা—দেশের কাজ, খদ্দর বেচা…ভাবনা? হুঁঃ!

গোবিন্দচরণ ভাবিলেন, তিনি বুঝি পাগল হইয়া যাইবেন! একে তো এই দুভাবনা, তার উপর হতভাগা বোকা মেয়েটা অকুতোভয়ে এ বলে কি! চরকা, খদ্দর… নাঃ, এর আর আশা নাই!

শান্তি কহিল,—তুমি তো কাগজ-পত্র কিছু পড়ো না দাদু। ওই যে মাসিকপত্র আছে একটা—কচি ও কাঁচা নাম,—তাতে একটা গল্প পড়েছিলুম কিছুদিন আগে,—বেশ গল্পটি, কাঙ্গালীচরণ কোঙারের লেখা। কোঙার এখন মস্ত বড় লেখক, দাদু…তা গল্পটায় লিখেচে, এক স্বামী আর তার স্ত্রী ছিল, তাদের বনিবনা হতো না—স্ত্রী তাই স্বামীর ঘর ছেড়ে নানা বিপদ-আপদ কাটিয়ে এক সেবাশ্রমে কুষ্ঠরোগীর সেবা করতে গেল…

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—আর স্বামী?

শান্তি কহিল,—জব্দ হলো…রোগে পড়ে কাৎরাতে লাগলো…

গোবিন্দচরণ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন,—বলিস কি রে? এ পাগলের গল্পও মানুষ লিখে ছাপিয়েচে, আর তোরা সেই লেখা পড়িস্!

শান্তি কহিল,—কেন পড়বো না? এই তো নতুন যুগের বাণী · তুমি আমায় ছাখো যদি তো আমিও তোমাকে দেখবো···না হলে বিয়ে করেচো বলে তোমার আস্ফালন সইবে স্ত্রী—তা চলবে না! স্বামীর দল তবেই না জব্দ হবে···.

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—থাম্, থাম্, এমন কথা বলিস্ নে···সকলে গোঁয়ার হয়ে এই নীতি ধরে যদি, তা হলে তো আবার সেই আদিম বর্ব্বর যুগের মারামারি কাটাকাটি সুরু হবে! সকলকে সব-রকম ঘা বরদাস্ত 'করে' সইয়ে নিতে হবে আত্মীয়-স্বজনকে। না হলে যে বর্ব্বরতার সীমা থাকবে না রে! ও-সব পাগলামি মনের কোণেও ঠাঁই দিস্ নে! হাসপাতাল, সেবাশ্রম?·· বলে, আত্মীয়-বন্ধুব সেবা করবার বেলায় হাত ওঠে না, আর হাসপাতালে যাবে ঝণ্টু ম্যাথবের বমি সাফ করতে আর সেখ হবিবের ঘা ধুতে—তবেই আব কি মস্ত কর্ত্তব্য করে চতুর্ভুজ হবে সব! খবরের কাগজে ছাপালেই advertising সেবা হয়, ওতে কোন ফল নেই ·তা ছাডা ইংবাজীতে কথা আছে—charity begins at home—ভারী খাঁটি কথা এটা। দেখছিস্ না, আজ পঞ্চাশ বছর ধরে 'ভারত-মাতা' বেরিয়েচেন, তাঁব সেবাব নাম করে ওস্তাদ-ধুরন্ধররা কি পয়সাটাই কামিয়ে নিচ্ছে, বোকার-দলের চোখে ধুলো দিয়ে · নিজের মাতার মাথায় তেল নেই! বেশ তো, করো পরের সেবা ··তা বলে আত্মীয় বন্ধুকে ভাসিয়ে দিয়ে নয় তাদের সেবাব সঙ্গে সঙ্গে। যাক, ও-সব বাজে কথা, আমি কি ঠাওরেচি, শোন্···

শান্তি সকৌতূহল দৃষ্টিতে গোবিন্দচরণেব পানে চাহিল।

গোবিন্দচরণ কহিলেন—কাল সকালেই আমি হেমন্তর কাছে যাই, তাকে নেমন্তন্ন করে আনি। তুই দেখা কর্। দেখা হলেই সব মিটমাট হয়ে যাবে···এই অবধি বলিয়া তিনি হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন—

আমাদেরও একদিন তোদের বয়স ছিল রে ক্ষেপি···এমন বুড়ো চিরদিন নই—যা-তা নিয়ে কত মান, কত অভিমান! মনে হতো, জীবনে বুঝি আর মুখদর্শন ঘটবে না···তার পর তেমনি বাজে ছুতো ধরেই আবার কত মিল! এই যে রাগ করেচিস্—এ রাগের মধ্যেও কি মনে হচ্ছে না···কখন্ সে আসবে? কেন সে চলে গেল? বল্ তো···না, বল্‌তেই হবে···

রসিক বুড়া গোবিন্দচরণ নাতিনীর হাতখানি মুঠার মধ্যে বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, ধরিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—মুখ ঢাকচিস যে! এ হতেই হবে—সে চলে গেল বলে তোর রাগ আরো বাড়চে···

শান্তি কহিল—বয়ে গেছে···তবে হাঁ, মিছে বলবো না···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কি মিছে বলবি না, তাই বল্···

শান্তি কহিল,—এতখানি পথ, এই রাত্রি—না চলে গেলেও বাবুর মান খোয়া যেতো না···

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কিন্তু এখানে কার কাছে থাকতো? তুই যে আমোল দিলি না মোটে!

শান্তি কহিল,—কেন, আর কেউ ছিল না তার আপন-জন এখানে? তুমি···?

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—আমি! হাঃ হাঃ হাঃ—এই রাত্রিটা কি বুড়োর সঙ্গে কাটাবার জন্যেই জ্যোৎস্না দিয়ে তৈরী হয়েছিল রে পাগলী?

৪

রাত্রি বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ীর সকলে নিদ্রায় অভিভূত। সত্য আসিয়া গোবিন্দচরণের ঘুম ভাঙ্গাইল। তিনি ধড়মড়িয়া উঠিলেন; কহিলেন,—কি রে? উদ্বেগে তাঁর বুক কাঁপিয়া উঠিল।

সত্য কহিল,—জামাইবাবু···

—হেমন্ত ?

—হ্যাঁ।

—কোথায় রে ? কি হয়েচে ?

সত্য কহিল,—এসেচেন। নীচে বসে আছেন। আমায় বল্লেন ওপর দিতে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—ওপরে নিয়ে এলিনে কেন সঙ্গে করে ?

সত্য কহিল,—এলেন না।

বৃদ্ধ মহা-উদ্বেগ বক্ষে বহিয়া শশব্যস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন।

হেমন্ত কহিল,—এত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করলুম। কিন্তু উপায় ছিল না, দাদামশায়

গোবিন্দচরণ সস্নেহে তার পিঠে হাত রাখিয়া কহিলেন,—কি হয়েচে দাদা, বলো তো ? আমার মহা ভাবনা

বাধা দিয়া মৃদু হাসিয়া হেমন্ত কহিল,—হয়নি এমন কিছু, তবে ··

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কি তবে ?

হেমন্ত খামে-আঁটা একখানি চিঠি গোবিন্দচরণের হাতে দিয়া কহিল,—এই চিঠিখানা তাকে দেবেন। আমার যা-কিছু বক্তব্য, এতেই লেখা আছে। মানে

গোবিন্দচরণ কলের পুতুলের মত হাত বাড়াইয়া পত্র লইলেন, কহিলেন,—শান্তির চিঠি ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু, এর কি দরকার, দাদা ? তুমি এসো আমার সঙ্গে। কি সব ছেলেমানষি যে করো তোমরা···

—না, দাদামশায়। ওই চিঠিখানা দয়া করে তাকে দেবেন। আমি চললুম।

বৃদ্ধ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! এ তো ভাল হেঁয়ালির পালা চলিয়াছে আজ! না, এ একটা দুঃস্বপ্ন? তারই সেই দুর্ভাবনার রাশি জড়ো হইয়া এগুলার সৃষ্টি করিয়াছে? তাই-বা কি করিয়া হয়! এই ত চোখের সামনে হেমন্ত,...আর তার কথার সঙ্গে তেমনি মিল রাখিয়া তাঁর নিজের হাতে এই চিঠি...!

তিনি কহিলেন,—যেতে পাবে না দাদা। আমি যেতে দেবো না। বুড়োর কথা ঠেলে কেমন যাবে, যাও দিকিন্।

হেমন্ত তাঁর পদধূলি লইয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইল এবং গদগদ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—আপনি ক্ষমা করুন দাদামশায়, আমার মনের অবস্থা এখন...মানে, রাত্রে আমি এখনও কিছু খাইনি।

—খাওনি! তা হলে তো—ওরে সত্য·

আর সত্য! হেমন্ত তখন ঝড়ের বেগে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছে!

বৃদ্ধ শশব্যস্তে ডাকিলেন,—ওরে সত্য, আঃ, কোথায় গেলি! কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হইয়া ভাবিলেন, এত রাত্রে চীৎকার ও চেঁচামেচি করিয়া কি একটা—তা ছাড়া, এরাই বা ভাবিবে কি! জামাইবাবু এত রাত্রে আসিয়া চোরের মত সহসা ছুটিয়া পলাইলেন কেন? ছি!

কিন্তু এমন বিপদেও তিনি কখনও পড়েন নাই। স্বর্গ-গতা গৃহিণীর উপর রাগ ধরিল· ·এই পাগল মেয়েটাকে তাঁর ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া গেলেন বেশ। গিয়া মজা দেখিতেছেন! তাঁর কি এ বয়সে ··? অদৃষ্টের ভোগ!

এই রাত্রে শান্তিকে ডাকিয়া চিঠিটা দিবেন কি? না। তার মানে তো এই রাত্রে আবার তার সঙ্গে খানিক তর্ক তোলা! যা হয় কাল,

সকালেই—ছেলেটাও তিড়বিড় করিয়া চলিয়া গেল,—ও দুই সমান মেজাজ!

ভোরেই গোবিন্দচরণের ঘুম ভাঙ্গিল। উঠিয়া সোজা নীচে নামিয়া বাড়ীর বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন, মাথার মধ্যে দুশ্চিন্তাগুলা আবার একে একে আসিয়া জড়ো হইতেছিল, হঠাৎ পিছনে কে ডাকিল,—দাদামশায়।

চমকিয়া ফিরিয়া তিনি দেখেন, হেমন্ত। তার চোখ দুটা লাল, ফুলিয়া উঠিয়াছে, মাথার চুল রুক্ষ, বিশ্রী মূর্ত্তি!

হেমন্ত কহিল,—চিঠিটা তাকে দেছেন, দাদামশায়?

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—চিঠি! না,—মানে, অর্থাৎ সে তখন ঘুমুচ্ছিল কি না!

হেমন্ত কহিল,—ভালোই হয়েচে! সে চিঠি আর দিতে হবে না। সেটা দয়া করে আমায় যদি ফিরিয়ে দেন···

হেমন্তর মুখের পানে গোবিন্দ চাহিলেন। এরা একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে! বদ্ধ পাগল!

হেমন্ত কহিল,—মানে, আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েচে, অর্থাৎ সে চিঠি দেবার প্রয়োজন নেই।

বৃদ্ধ ভাবিলেন, না, এরা বড়ই বাড়াবাড়ি করিতেছে, আর বাড়িতে দেওয়া ঠিক নয়! হইয়াছে কি? অত বড় জর্ম্মান যুদ্ধের সূচনাও যে এমন নিবিড় হইয়া দেখা দেয় নাই! আর এ···?

তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, চিঠি-চাপাটির কথা পরে হবে'খুন। এখন এসো দিকি, মাথা ঠাণ্ডা করে বুড়োর দুটো উপদেশ শুন্‌বে এসো —বুড়ো হলেও 'ফুল' এখনও হতে পারিনি। তবে তোমরা কাল থেকে যে পাগলামির সার দিতে সুরু করেচো, পরে কি হবে বল্‌তে পারি না।

বৃদ্ধ জোর করিয়াই হেমন্তর হাত ধরিলেন, হেমন্ত দৌরাত্ম্য করিল না। বৃদ্ধ তার হাত ধরিয়া তাকে আনিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন, কহিলেন,—কাল রাত্রে কি গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়িয়েচো, না বাড়ী গেছলে?

হেমন্ত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—বাড়ী গেছলুম বৈ কি!

বৃদ্ধ কহিলেন,—নিদ্রার সঙ্গে আলাপ হয়নি মোটে?

হেমন্ত সলজ্জভাবে মাথা নামাইল, কোন কথা কহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আচ্ছা, বসো, এক পেয়ালা চা খাও, তার আগে একবার বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসো দিকিনি। ভয় নেই, শান্তিকে খপর দেবো না, আমি চুপি চুপি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। একটু ঠাণ্ডা হও, তার পর আমার পরামর্শ শোনো। মানভঞ্জন করার বিদ্যা খুব তো জানো! খালি মনটাকে জ্বালাচ্চ। লেখাপড়া শিখেচো ছাই! তোমাদের এক ধূয়ো হয়েচে আজকাল, শুনি, মনস্তত্ত্ব, সে তত্ত্বের কিছুই জানো না! যাক্, আমি আস্চি। তুমি মুখখানা ধুয়ে এসো। ওঠো দিকিনি লক্ষ্মী দাদা আমার···

দাদা নিরাপত্তিতে উঠিয়া বাথরুমে গিয়া ঢুকিল। গোবিন্দচরণ ছুটিলেন সত্যর সন্ধানে। সত্য পাকা খানসামা। তাকে টোষ্ট রুটী ও চায়ের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া তিনি ফিরিলেন। হেমন্ত তখন মুখ-চোখ ধুইয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। গোবিন্দচরণ কহিল,- কাপড়টা ছাড়বে?

হেমন্ত কহিল,—থাক গে।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—বেশ, তা চা আসচে, খাও, দু'টুকরো রুটী খাও, আর আমার বুদ্ধি শোনো ··এ সব মান-অভিমান করে মনকে কখনও জ্বালাতে আছে! ছি! তাতে ওর মজাটুকু পাওয়া যায় না।

যে···বুঝলে ভায়া, আমাদেরও মান-অভিমান হতো প্রচুর, আর সে মানভঞ্জনের পালা যে কি মধুর হতো! শোনো তবে, এক দিনের কথা বলি।

বৃদ্ধের প্রাণে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার দিনগুলা ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিয়া জাগিয়া উঠিল। যেন হীরার অসংখ্য কুচি! সব গিয়াছে। এ স্মৃতিগুলা প্রাণ হইতে ভাগ্যে কেহ কাড়িয়া লয় নাই, নহিলে কি সম্বল লইয়াই যে জীবনেব এ নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলা কাটাইতেন! বৃদ্ধ সেই সব কাহিনী বলিয়া চলিলেন—জীবনের অতি-তুচ্ছ পরিচ্ছেদেব ক'টা ছিন্ন অংশ···তবু কি কবিত্ব, কি বস যে সেই সব ছিন্ন অংশে

চা আসিল, সঙ্গে সঙ্গে টোষ্ট-রুটী। হেমন্ত কহিল,—আমি আজ বেড়াতে যাবো, ভাবচি।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—কোথায়? কাছাবি?

হেমন্ত কহিল,—গেলেও যা, না গেলেও তাই। কোনো মক্কেল কাতব হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে না।

—তবে কোথায় যাবে?

হেমন্ত কহিল,—গিবিডি, কি মধুপুব, নয় তো দার্জ্জিলিং।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—অর্থাৎ কলম্বো কি নেপালও হতে পারে! মানে, স্থির করোনি কিছু?

হেমন্ত কহিল,—ঠিক এখনই করে ফেল্‌বো।

গোবিন্দচরণ কহিলেন,—ছায়ুব ওপর বাগ হয়েচে বলে তো? তাতে আরাম পাবে না দাদা, দু'জনেব কেউ না! তুমি কাল দেখা করতে না পেয়ে যেমন রাগ করেচো, সেও দেখা না দিয়ে তেমনি রাগ করেচে···তবে তোমার রাগ তার উপর, আর তার রাগ তার নিজের উপর।

হেমন্ত বিস্ময় বোধ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একটু খুশীও হইল। গোবিন্দচরণ কহিলেন,—মাথা ধরলে বাতের ওষুধ লাগালে কখনও মাথা-ধরা ছাড়ে? যে রোগের যা দাওয়াই! তরুণী পত্নীর মানের দাওয়াই আমি বাৎলে দিচ্ছি,—ত্যাখো দিকিন অব্যর্থ হয় কি না!

বৃদ্ধ সতর্কভাবে চারিধারে চাহিলেন, কেহ নাই তো? না! তিনি চুপি চুপি কি কতকগুলা বকিয়া চলিলেন…মস্ত অভিসন্ধি! হেমন্তর মুখের ঘোরালো ভাব সে-কথায় কাটিতে লাগিল, শেষে মেঘমুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল মুখ! হাসির ছটাও সে মুখে দেখা দিল!

বৃদ্ধ কহিলেন,—ছাহু বোধ হয় উঠেচে। তাকে খবরটা দিয়ে আসি। কিন্তু অভিনয় ঠিক করে যেয়ো। ভয় নেই, আমি সেই বাগানের ওধারে সরে যাবো'খন—আড়ি পাতবো না, ভায়া।

হেমন্ত হাসি চাপিয়া ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আমি ছানুকে খপরটা দিই গে, তা হলে। আর তোমার সে চিঠিখানাও নিয়ে আস্‌চি।

৫

দ্বারের বাহিরে পায়ের মৃদু শব্দ। হেমন্ত গম্ভীর হইয়া বসিল। শান্তি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। হেমন্ত খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলিল, নিশ্বাসের শব্দ যেন শান্তি শুনিতে পায়, এত বড় নিশ্বাস!

শান্তি কহিল,—দাদু নেহাৎ বল্‌লে,—সে থামিল।

হেমন্ত ঠোঁট বাঁকাইয়া গম্ভীর মুখে শান্তির পানে চাহিল। শান্তির মুখ শুষ্ক, চোখ দুইটা লাল! সেও তাহা হইলে রাত্রে ঘুমায় নাই নাকি? হেমন্তর মনে হইল, দূর হোক্ এ কৃত্রিম অভিনয়! কিন্তু না…

শান্তি টেবলের উপর একটা আঙুল ঘষিতে ঘষিতে কহিল,—সেই খপর দিতে বুঝি আজ…

হেমন্ত কহিল,—মানে, অর্থাৎ তা জানানো আমার কর্ত্তব্য। তাই…

শান্তি কহিল,—অসীম অনুগ্রহ! তা এ অনুগ্রহ না করলেও চলতো! (একটু চুপ; তার পর একটা নিশ্বাস চাপিয়া) জানবার জন্য ব্যস্তও ছিলুম না, মোটে।

এখনও সেই অভিমানের ছিটা! হেমন্ত কহিল,—না থাক্‌লেও আইন-ঘটিত সমস্যা আছে এর মধ্যে, তাই। অর্থাৎ—

শান্তি কহিল,—এ ভাগ্যবতী সুন্দরীটি কে?

হেমন্ত কষ্টে হাসি চাপিয়া কহিল,—ভাগ্যবতী কি না, তা বল্‌তে পারি না, তবে সুন্দরী বটে! আর বিদুষী—

নিশ্বাস চাপা গেল না, সে জন্য শান্তি একটু অস্বস্তিও বোধ করিল। কহিল,—ভালোই তো, আমার মত একটা লক্ষ্মীছাড়া মুখ্যু প্যাচা বৌ গিয়ে তার বদলে সুন্দরী বিদুষী স্ত্রী আস্‌চে, এ খুবই সুখের কথা!

হেমন্ত কহিল,—আশীর্ব্বাদ করো, সেই সুখই হোক্‌,…দুঃখে বেদনায় প্রাণ আমার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শান্তি কহিল,—বিয়ে কবে, শুনতে পাই কি?

হেমন্ত কহিল,—তারিখ শুনে লাভ! বিয়ে করচি, এই খপরটুকুই তো তোমার পক্ষে যথেষ্ট!

শান্তি কহিল,—তবু…না হয় আশীর্ব্বাদ করে আস্‌বো। ভয় নেই। সতীন বলে হিংসা করবো না। শান্তির আর একটা নিশ্বাস পড়িল। আর বুকের মধ্যে যা হইতেছিল, তা অন্তর্য্যামীই জানেন!

হেমন্ত কহিল,—এই শনিবারে বিয়ে। মানে রবিবারে কাছারিও নেই…

শান্তি কহিল,—কনেটি কে, জানতে পারি না? ভয় নেই, ভাঁংচি দিতে যাবো না।

হেমন্ত কহিল,—বিশ্বাস?

শান্তি কহিল,—এমন নীচ আমি নই। দুষ্টু, পাজী, অবাধ্য হতে পারি, তা বলে অত ছোট মন—

হেমন্ত কহিল,—ধন্যবাদ! তবে তুমি তাঁকে চেনো।

সে চেনে? শান্তির চোখের সামনে এক ঝাঁক পরিচিতা তরুণী নিমেষে দল বাঁধিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। কমলা, পারুল, পরী, জ্যোতি, রাণী,—কে? দুই চোখে আকুল প্রশ্ন ভরিয়া সে হেমন্তর পানে চাহিল; কোনমতে প্রশ্ন তুলিল;—বুঝেচি, পারুল?

হেমন্ত কহিল,—না।

শান্তি কহিল,—নিশ্চয়। তার সুখ্যাতি মুখে যে ধরতো না! কেমন গান গায়, কি সুন্দর ইংরিজী কবিতা পড়ে।

হেমন্ত কহিল,—না, পারুল নয়। নামটা থাক্ তবে। একটা মুস্কিল হয়েছে, আর…তাই সে সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে একটু কথা কওয়া দরকার।

শান্তির বুক ঠেলিয়া অশ্রুর ঝর্ণা ছুটিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। তার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

হেমন্ত কহিল,—মানে, কাল এখান থেকে গিয়ে তাদের ওখানেই উঠেছিলুম। সব শুনে তাঁরা সহানুভূতি জানালেন, আর তিনি বললেন,…

শান্তি বলিয়া উঠিল,—নিজের মুখে? মা গো, কি বেহায়া! এই

অবধি বলিয়া সে জিভ কাটিল। কহিল,—মাপ করো, তোমার বিদুষী সুন্দরী নববধূকে বেহায়া বলে ফেলেচি!

হেমন্ত কহিল,—যা বলেচো, বলেচো! খবর্দ্দার! আর কখনো কিন্তু বলো না।

শান্তি জ্বলিয়া উঠিল। এত দরদ! সে কহিল,—সে কথা বলা-না-বলা আমার খেয়াল! কারো হুকুম মানতে হবে কেন, শুনি?

হেমন্ত কহিল,—যাক্, শেষ বিদায়ের সময় তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না···সেই কথাটি এখন শোনো। মানে, তিনি জানিয়েচেন, ঘরে পর্দ্দা তুমি যা-সব খাটিয়েচো, তার রং গোলাপী না? তিনি বলেন, ও রং তাঁর চোখে বিশ্রী ঠেকে, ও পর্দ্দা চলবে না। ও পর্দ্দা বদলে সবুজ পর্দ্দা দিতে হবে। আর তুমি যে ছবি খাটিয়েচো, সে ছবি তাঁর পছন্দ নয়। তিনি বলেন, ও ইণ্ডিয়ান-আর্টের ছবি তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না, সেগুলোকে বিদায় দিতে হবে। আর তুমি যে ভালো আল্‌মারীটায় ভাঁড়ারের জিনিষ রাখছিলে, সেটায় তিনি যত বাংলা মাসিক পত্রগুলো ঠেসে রাখতে চান,···তা এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?···তাই···

শান্তি সবেগে জবাব দিল,—তোমাদের ঘরকর্ণা! তোমরা যা খুসী, তাই করবে। আমাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার দরকার নেই তো!

হেমন্ত কহিল,—এ বেশ কথা,···তা, হ্যাঁ, বিবাহ তো করবো, এর পরে তুমি কোনো দিন হুম্ করে গিয়ে হাজির হবে না তো? তা গেলেই না মুস্কিল! দুই স্ত্রী নিয়ে, শেষ কালে সেই রবিবাবুর দড়ী-কলসীর দায়ে ঠেকবো কি! এ সম্বন্ধে একটা আশা যদি দাও··· তা ছাড়া তোমার দীর্ঘ জীবন একটা ভুলের জন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে···?

শান্তি বলিল,—ভয় নেই, ভয় নেই, কোনো ভয় নেই গো। আমিও 'মধুযামিনী' উপন্যাস পড়েচি, মিনতির মত আমারো মনের জোর আছে। যে-ঘরে আমার ঠাঁই হলো না, সেখানে আমি,...না, না, না...বলিতে বলিতে বায়ুবেগে একখানা মেঘের মত সে অশ্রুর বন্যায় ফাটিয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল,—রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে রোগীর সেবা করে আমার দিন বেশ কেটে যাবে, আমার জন্য কাকেও ভাবতে হবে না।...

এ দৃশ্যে পাষাণ গলিয়া যায়, তায় হেমন্ত তরুণ এবং স্বামী! আবেগে শান্তির দুই হাত ধরিয়া টানিয়া সে তাকে পাশে বসাইল, বসাইয়া তার চোখের জল মুছাইতে মুছাইতে কহিল,—শান্তি, শান্তি, আমায় মাপ করো...তুমি পাগল হয়েচো। আবার আমি বিয়ে করবো, এ কি সম্ভব? আমার অবস্থা দেখে তোমার মন ফিরে পাবার জন্য দাদামশায় এ মতলব বাৎলে দেছেন...তুমি অভিমান করে চলে এসেচো, আর আমার আহার নেই, নিদ্রা নেই! এইখানেই কাল ঘুরে বেড়িয়েচি সারা রাত...ট্যাক্সিওয়ালাটা পাছে পাগল ভাবে, এই ভয়ে তাকে রাত বারোটার পর এই বাড়ীর দোরেই বিদায় করেচি। সে গাড়ী নিয়ে চলে গেলে ওই রোয়াকে পড়েছিলুম, তার পর যখন রাত চারটে...তখন গিয়ে গঙ্গার ধারে জেটীতে বসেছিলুম...ভোর হতেই আবার আসি। একটিবার তুমি দেখা দাওনি!...নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর,...কি আমি করেচি, কি এমন অপরাধ...যার মার্জ্জনা নেই? কাল রাত বারোটায় কি চিঠি লিখে এনেছিলুম, পড়ে যদি দেখতে...

খামখানা ছিঁড়িয়া হেমন্ত চিঠি বাহির করিয়া শান্তির সামনে ধরিল। তাহাতে লেখা আছে,—প্রিয়া! প্রিয়া! বিদায়...জন্মের মত বিদায়...

শান্তি সেটা কাড়িয়া সরোষ ভঙ্গীতে স্বামীর পানে চাহিল, কহিল,—দুষ্টু...এমন চিঠি লেখে!

হেমন্ত শান্তির হাত চাপিয়া ধরিল; হঠাৎ এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ...

শান্তি কহিল,—দাদু...বলিয়াই ঠিক আগুন-লাগা বাজির মত সে ছিট্‌কাইয়া দূরে সরিয়া গেল। গোবিন্দচরণ ঘরে ঢুকিলেন, কহিলেন,—তা হলে তোমার কলম্বো যাওয়াই স্থির তো হে ভায়া...? আজই?

ভায়া চুপ! শান্তি বলিল,—তা আর হলো কৈ! এই শনিবারে তোমার নাতজামাই যে আবার বিয়ে করচে...সে-বৌকে বরণ করে তুলতে হবে। আজই আমার খিদিরপুর যাওয়া চাই। না হলে গোছগাছ হয়ে উঠবে কেন? আর তুমি ঘটক-ঠাকুরমশাই, শনিবারে যেয়ো—ঘটক-বিদায় যা পাবে, তা উত্তম-মধ্যম...বুঝলে...

গোবিন্দচরণ হাসিয়া কহিলেন,—তা তো পাবোই রে। আমি এমনি নরাধম যে, উত্তম-মধ্যম আমার বেলাতেই, আর ঐ নরোত্তমের বেলায়...বলিয়া তিনি মৃদু হাসিলেন, হাসিয়া কহিলেন,—ঘেঁষাঘেঁষি বসেছিলেন, এখন আবার তড়াক্ করে সরে যাচ্ছেন, দু'জনে দু'দিকে! ওরে, বুড়োর চোখে ধূলো দেওয়া তোরা, যত সহজ ভাবিস তত সহজ, তা নয়! আর বুদ্ধি? দেখছিস্ তো ভায়ার মুখে এই হাসি, এ কার বুদ্ধির ফলে, এঁ্যা?

একটি ব্যাগের কাহিনী

আমার এক বন্ধুর কীর্ত্তি।

বন্ধুর নাম কুমুদিনী। তিনি নারী নন্, পুরুষ। তবে তাঁর চিঠি-পত্র নিয়ে আমার বাড়ীতে একবার এমন বিপ্লব বেধেছিল যে, আমরা বন্ধুর দলে মিটিং ডেকে দস্তুরমত রেজলিউশন পাশ করি যে, ও-নামে তাকে ডাকা হবে না, আমরা নেউগী বলে ডাকবো। আমাদের গিরিজাকে সে একবার চিঠি লিখে তলায় নাম দিয়েছিল,—'তোমার কুমুদিনী'। তার ফলে গিরিজা-গৃহিণী অর্থাৎ শ্রীমতী বৌদি মানের ভরে পিত্রালয়ে চলে যান্ এবং দাদার কথাতেও ফেরেন নি! আমরা সদলবলে গিয়ে নজীর-পত্র খুলে ওকালতি করি, শেষ কুমুদিনীকে সশরীরে সাক্ষী হাজির করাতে তবে তাঁর রাগ যায়, তিনি আবার গিরিজা-মন্দিরে এসে সিংহাসন আলো করে বসেন। কিন্তু সে কথা যাক্। যা বলছিলুম,—

নেউগী থাকে মফঃস্বলে, কলেজ-ছাড়া ইস্তক। রাজশাহীতে তার পৈতৃক জমিদারী আছে, তাই দেখাশোনা করে, আর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে—কিন্তু এ কথাও বলতে আসিনি।

বাড়ীতে তার বোনের বিয়ে। এইটিই সব ছোট। বর-পক্ষ খাট-পালঙ্ ইত্যাদি দ্রব্য-সামগ্রীর এক মস্ত ফিরিস্তি দিয়েছিল,—নগদ টাকার কামড় করেনি, এইটেই পরম অনুগ্রহ। নেউগী এসেছিল কল্‌কাতায়, সেই সব জিনিষ নিজে দেখে পছন্দ করে কিনতে। জমিদার লোক, কল্‌কাতায় একরাশ বন্ধু-বান্ধব থাকা সত্ত্বেও তাদের কারো

বাড়ী আতিথ্য না নিয়ে (যেমন গ্রহ !) সে এসে উঠলো, প্যারাডাইস বোর্ডিংয়ে। ঘোরাঘুরির ফাঁকে আমাদের সঙ্গে টক্ করে এক-আধবার যা দেখা করে যেতো ! আমরা ঠাট্টা করতুম,—দ্বিতীয় পক্ষর সঙ্গে সঙ্গে বয়সে তারুণ্য এলো বুঝি, তাই আমাদের প্রৌঢ়দের দলে ভিড়তে চাও না আর ! রাধিকা বললে,—তা নয় হে, ও রোজ আট পাতা করে চিঠি লেখে বৌকে রাত্রে শুতে যাবার আগে, আর সকালে তাঁর ষোল পাতা করে জবাব পড়ে প্রত্যহ, তার পর দুপুরে বাজারে ঘোরে, কাজেই দেখাশুনা করবার ফুরসৎ কোথায় !

যাক্, সেদিন কোর্টে এক স্ত্রী-চুরির মকর্দ্দমায় জেরার ধারায় একখানি বিচিত্র রোমান্স বানিয়ে জুনিয়রদের মনে প্রচুর মিষ্ট রসের সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসতেই সামনে দেখি, নেউগী। আমি বললুম,—ব্যাপার কি হে ! কোর্টে হঠাৎ ?

মুখে একটু কুণ্ঠিত হাসির রেখা টেনে নেউগী বললে,—আর বলো কেন ! কাল এক পকেট-মারের হাতে পড়েছিলুম।

আমি বললুম,—অর্থাৎ ?

নেউগী বললে···বড়বাজারে কতকগুলো জিনিষ কিন্‌বো বলে কাল ট্রাম থেকে যেই নেমেচি হ্যারিসন রোড আর চিৎপুরের মোড়ে, অমনি পকেটে টান পড়লো ! ব্যস্, চেয়ে দেখি, ব্যাগ নেই ! চীৎকার করলুম। দুটো-তিনটে মুসলমান ছোক্‌রা ছুটছিল চিৎপুর রোড ধরে, তাদের পিছনে তাড়া করলুম চোর-চোর বলে চেঁচাতে চেঁচাতে। হঠাৎ সামনে এক ট্যাক্‌সি ! চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলুম। তার পরে দেখি, পুলিশ একটাকে ধরেচে, আর পুলিশের হাতে মনি-ব্যাগ। ব্যাগটা আমারই। তবে ওরি মধ্যে খালি করে ফেলেচে !

আমি বললুম—হ্যাঁ, ওদের হাত-সাফাই খুব !

নেউগী বললে,—ব্যাগে ছিল একশো সাঁইত্রিশ টাকা তেরো আনা আর কটা পয়সা। তার তো কিছুই মিল্‌লো না। তার পর আমি ফিরব বোর্ডিঙে, পুলিশ ছাড়ে না, নিয়ে চললো বড়বাজার থানায়। সেখানে কেশ লেখানো হলো। ইন্‌স্‌পেক্টরকে আমি বললুম,—মশায়, আমার টাকা গেল, ফিরে পেলুম না, মিছি-মিছি এখন কেশ লিখিয়ে কি হবে? ঐ ছেঁড়া ব্যাগ নিয়ে ঝামেলা করা পোষাবে না, সে সময়ও নেই আমার! তারা শোনে না, বলে,—সে কি মশায়, বামাল-সমেত আসামী গ্রেপ্তার হয়েচে, আমরা তো ছেড়ে দিতে পারি না। তাই,—ত্মাখো না, কোর্টে আসতে হয়েচে! পুলিশ আসামীকে কোর্টে চালান দিয়েচে—তার ওপর মামলারো তারিখ পড়ে গেল, বারোই জুন।...কি করি এখন? ১০ই জুন আমার বোনের বিয়ে, আজ তো ২৭শে মে।

আমি বললুম,—চলে যাও বাড়ী। পরে সফিনা পেলে এসো।

নেউগী চলে গেল।—তার পর তার মামলার কথা আমি ভুলেই গেলুম।

আরো দু'মাস কেটে গেছে। সেদিন কোর্টে যাইনি, অন্য কাজ ছিল। সন্ধ্যার পর বাহিরের ঘরে তাকিয়ায় মাথা রেখে একটা খপরের কাগজে মনোনিবেশ করেচি, এমন সময় নেউগী এসে হাজির। বাহিরে ঝুপঝুপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল,—জলো হাওয়াটুকু গায়ে মিঠে লাগছিল বেশ!

আমি বললুম,—এই বৃষ্টিতে আবার কোথা থেকে হে? কলকাতায় এলে কবে? ভালো কথা, তোমার সে মামলার কি হলো?

নেউগী বললে,—সেইজন্মেই এসেচি তোমার কাছে, দুঃখ জানাতে। কম কর্ম্মভোগ গেছে আজ! শুনলে এখনি কেঁদে ফেলবে।

আমি বললুম,—বসো, বসো। কি পাগলের মত বকচো!

নেউগী পকেট থেকে রুমাল বার করে মাথার আর মুখের জল ঘষে-মুছে বল্‌লে,—পাগল করে দেছে, আর পাগলের মত বক্‌বো না সেই কথাই বলতে এসেচি।·· জিজ্ঞাসা করছিলে না, কলকাতায় এলুম কবে? তা এবারে আমি কি নিজে কলকাতায় এসেচি ভাই? পুলিশ ওয়ারেণ্ট করে আমায় ধরে এনেচে।

আমি বললুম,—ওয়ারেণ্ট!

—হ্যাঁ, ওয়ারেণ্ট।

—ওয়ারেণ্ট কেন?···ও, তুমি বুঝি সে মামলায় হাজির হও নি সাক্ষী দিতে, তাই?

নেউগী বললে,—ঠিক। শোনো এখন ব্যাপার—সেই যে মামলার তারিখ পড়লো বারোই জুন, তা ১০ই তো গেল আমার বোনের বিয়ে। পাড়াগাঁর বিয়ের সমারোহ চুকতে কত সময় লাগে, তোমাদের জানা নেই, বোধ হয়। বাড়ীতে এক-বাড়ী লোক ঠাশা, তবু বারোই যে আমার মামলা, সে কথা মনেও ছিল। কোর্টে যখন তারিখ পড়ে, তখনি কোর্ট-ইনস্পেক্টরকে আমি বাড়ীতে বিয়ের কথা বলেছিলুম। তা তিনি খ্যাঁক করে উঠলেন, বললেন,—ছুটো মকদ্দমার তারিখ ঐ বলে উল্টে নিয়েচি মশায়,—আবার এটার নেবো? ও কথা বল্‌লে সাহেব আমায় খেতে আসবে। আমি বললুম,—তা বলে আমি আসি কি করে? তিনি বললেন,—আসতেই হবে। আমরা আনিয়ে নেবো। কেশ্ করেছিলেন কেন?

আমি বললুম—মশায়, ঐ একটা ছেঁড়া খালি ব্যাগের জন্তে আমি কেশ্ করতে যাই নি। পুলিশ জোর করে কেশ করিয়েচে। আমি মানাও করেছিলুম। তা—

একটি উকিল বসেছিলেন কোর্ট-বাবুর পাশে। তিনি বললেন,—চলে যান না মশায়,—না হয় একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেবেন'খন। অত ভাবনা কেন? শুনে অবাক্ হয়ে গেলুম, অসুখ না থাকলেও মেডিকেল সার্টিফিকেট! কোন্ ভদ্র ডাক্তার এমন মিছে সার্টিফিকেট দেবেন? আর আমি তাঁকে তা দিতে বলবো কোন্ মুখে!···অতগুলো টাকা বরবাদ গেছে, মনটাও তখন খারাপ ছিল বিলক্ষণ! ভাবলুম, দূর ছাই, ল্যাঠায় কাজ নেই। ও বারো তারিখেই যা করবার তা তখন দেখা যাবে, এখন থেকে মিছে ভাবি কেন! এই ভেবেই বাড়ী চলে গেলুম বাজার করে। তারপর বিয়ে তো হয়ে গেল। একটা সফিনে গেছলো ইতিমধ্যে, তা বিয়ের গোলে মামলার কথা মনেও ছিল না। শেষে পরশু হলো কি, শোনো,—বলে নেউগী চুপ করলে; একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লে,—একটু চায়ের ফরমাশ করো তো হে! বৃষ্টিতে ভিজেচি, নাকটা কেমন সড়্ সড়্ করচে!

আমি আক্‌লুকে ডেকে বলে দিলুম, দু'পেয়ালা চা তোয়ের করে আন্‌তে! আক্‌লু চলে গেল। নেউগী বললে,—পরশু বাড়ীতে একটা কুটুম্ব-ভোজনের আয়োজন ছিল। বিস্তর লোকজন এসেচে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত, এমন সময় ওখানকার থানা থেকে ইন্‌স্‌পেক্টর এক চিঠি পাঠিয়ে দেছে,—থানায় আসবেন এখনি; ভারী দরকার! বুকটা ধড়াস করে উঠলো। থানায় এত জোর তলব কেন রে বাপু!······কাকেও কিছু না বলে থানায় গেলুম। গিয়ে শুনি, আমার নামে ওয়ারেণ্ট এসেচে। শুনে আমার হাত-পা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো, মাথা ঘুরে গেল। আমি কি চোর, না ঠক, না বাটপাড় যে আমার আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা! ইন্‌স্‌পেক্টর বললে,—পঞ্চাশ টাকার জামিন দিতে হবে। আর আজ কলকাতার পুলিশ কোর্টে

হাজির হতে হবে, সাক্ষী দিতে।…তবু ভালো! শুনে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বাড়ীতে লোক পাঠানো হলো। নায়েব এসে উপস্থিত। সে জামিনের কাগজ সই করলে। বাড়ীতে ফিরলুম যখন, তখন আত্মীয়-কুটুম্বের দলে মহা-ভাবনা চলেছে, এই স্বদেশীর যুগে কোনো পলিটিক্যাল কেশে জড়িয়ে পড়লুম না কি! তারপর ওধারে আমার স্ত্রীর দুবার ফিট হয়েচে! ভাবো একবার ব্যাপারখানা!

হাসতে হাসতে আমি বললুম,—তারপর?

নেউগী বললে,—তারপর আজ এখানে এলুম। তোমায় তো কোর্টে পেলুম না,—কোর্টের দালালরা পড়ে এমন ভয় দেখিয়ে দিলে যে, তখনি নগদ যোল টাকা ব্যয় করে এক উকিল খাড়া করলুম।

আমি বললুম,—উকিল?

নেউগী বললে,—হ্যাঁ, উকিল। তারা বললে, ভারী বেইজ্জৎ হবেন মশায়। কাজেই উকিল দিতে হলো। দিয়ে ব্যাপার শুনলুম—মামলা এসেছিল এক অনারারী হাকিমের এজলাসে, তাঁর না কি ভারী গোরা মেজাজ! সাক্ষী আসেনি—বটে? দাও ওয়ারেণ্ট! তাই ওয়ারেণ্ট হয়েচে। তারপর ভাই, উকিলটি আর তাঁর চেলারা বললে, পেস্কারের চাই চার টাকা, চাপরাশি দুজন দু'টাকা, সার্জেণ্ট এক টাকা, আর পাহারওয়ালারা এক টাকা—এই বলে আরো আট টাকা নিলে। তারপর আমি জামিন আনিনি সঙ্গে! ওরা বললে,—এখনি জামিন দিতে হবে আদালতে, নাহলে হাজতে পূরবে। শুনে আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখলুম! ভালো ব্যাগ চুরি গেছলো। এখন যে এ গোদের উপর বিষ-ফোড়া গজালো! তারা বললে, পেশাদার একটা লোককে পাঁচটা টাকা দিলে সে-ই জামিন দাঁড়াবে'খন, তাছাড়া তাকে সনাক্ত করতে আর একজন উকিল চাই! আমি বললুম,—কেন, উকিল তো দিয়েচি!

দালালরা হাসতে লাগ্‌লো, আর ষোল টাকার উকিল বাবুটি ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন,—ও কাজ আমরা করি না, ওতে ইজ্জৎ যায়! সনাক্তর উকিল দোশ্‌রা আছে,—দাও তার জন্যে চার টাকা, আর ষ্ট্যাম্প ইত্যাদির জন্যে এক টাকা,—আরো দশ টাকা খস্‌লো। সব-শুদ্ধ খরচ হলো চৌত্রিশ টাকা। তারপর মামলা উঠলো। যা' যা' হয়েছিল সব বললুম, ব্যাগটাও চিনে identify করলুম। তখন আসামীর উকিলের জেরা—এতে কি চিহ্ন আছে? এ রকম ব্যাগ বাজারে হাজার হাজার পাওয়া যায় কি না? আমি বললুম,—তা যায়, তবে এটা আমি বছর দুয়েক ব্যবহার করচি, তাই একে অমন পাঁচশো ব্যাগের মধ্যে থেকে চিনে নিতে পারি। আরো জেরা চললো। আসামী আর সাক্ষী ডাকলে না; একটু পরেই রায় বেরুলো। হাকিম আসামীকে খালাস দিলেন benefit of doubt বলে। তবে হুকুম হলো, ব্যাগটা আমাকে দেওয়া হবে। আমি ষোল টাকার উকিল বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করলুম,—আসামীকে ছেড়ে দিলে যদি, ব্যাগটাও ওকে দিলে না কেন? তিনি বললেন,—ব্যাগটা ও দাবী করে নি! আমি বললুম,—ব্যাগটা ওর কাছ থেকেই তো বেরিয়েচে! তিনি বললেন,—ও-সব আইনের কথা,—আপনি বুঝবেন না। তারপর আরো একটু ঝাঁজালো সুরে বললেন—আপনার দোষ যে! অত করে বলে দিলুম,—বলবেন যে ঐ লোকটাকেই পকেট থেকে ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে যেতে দেখেছি, তা আপনি সে কথাটা ভুলেই গেলেন! আমি বললুম,—আজ্ঞে, আমি তো ঠিক দেখিনি, তাছাড়া ট্যাক্‌সিটা হঠাৎ এসে পড়লো কি না, তাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে তখন আমি ব্যস্ত—

উকিলবাবু গরম হয়ে চলে গেলেন। তাঁর মুহুরি এসে বললে,—হাকিম অন্যায় করেচে, আপনি হাইকোর্ট করে দিন। দিন তো দেখি

স' দশ আনা পয়সা। নকলের দরখাস্ত করে দি, তারপর হাইকোর্টে যান,—এস্ কে সেন কৌশুলিকে দেবেন। এ হাকিমের উপর হাইকোর্ট ভারী চটা,—ওর রায় পেলেই উল্‌টে দেয়। আমি তো তার কথা কানে না তুলেই চলে এসেচি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম,—ব্যাগটা কোথায় ?

নেউগী পকেট থেকে সেটা বার করে বললে,—এই যে ! ব্যাগটি আমার লক্ষ্মী—এর দৌলতে কম লাভ হলো ! চোরে টাকা নিলে, তারপর এর জন্যে ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হয়ে এলুম,—আর চৌত্রিশটা টাকা আমাকে বেকুব বানিয়ে উকিল-মুহুরিরা মিলে লুঠে নিলে হে !

আমি বললুম,—এই ব্যাগটি নিয়ে এক কাজ করো। ভালো ফ্রেমে কাঁচ দিয়ে বাঁধিয়ে ঘরে টাঙ্গিয়ে রেখে দাওগে, নয় তো মিউজিয়মেও পাঠাতে পারো, কিম্বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লে। অন্ততঃ এর ছবি তুলিয়ে বিলেতের কোনো ম্যাগাজিনে পাঠাও—তলায় লেখা থাকবে, A bag that cost so much !

নেউগী হাসতে লাগলো।

আমি বললুম,—তোমার যেমন গ্রহ! না হলে মামলা তো আরো লোকে করে এবং করচেও।

নেউগী বললে,—সকলের কি মামলা করা সয় !

আমি বললুম,—যাক, এখন কি প্যারাডাইস বোর্ডিংএ যাবে, না, এই গরীবের কুঁড়েতেই…?

আমার কথা ফুরোতে না দিয়েই নেউগী বললে,—এই গরীবের কুঁড়েতেই রাতটা কাটাবো। মেম-সাহেবকে বলো—দুটি গরম ভাত আর মাছের ঝোল খাবো,—আর কিছু দাও বা না দাও ! তারপর কালই বাড়ী যেতে হবে, না হলে তাঁর যে রকম ফিট হচ্ছে দেখে এসেচি…!

বহ্বারম্ভ

তরুণ বয়সের পাগলামির কথা ! সবটা বুঝাইতে গেলে গোড়ার কথাও পাড়িতে হয়।

নতুন ডেপুটিগিরি পাইয়া আলিপুরে কাছারি করিতেছিলাম। থাকি ভবানীপুরে পৈতৃক ভিটায়। সংসারে সুখ ছিল, তবে একটু শান্তির অভাব ঘটিয়াছিল স্ত্রীকে লইয়া।

আসল কথা, আমি যদি উত্তরমুখে যাইতাম, স্ত্রী চলিতেন দক্ষিণ দিকে ! আমি চাহিতাম জীবনের তরুণ বসন্তের যা-কিছু মাধুরী সব ভরপুর উপভোগ করিতে, সংসার যদি তার মাঝে উবিয়া যায় তো যাক্‌ ! স্ত্রী কিন্তু জীবনের এই বসন্তের পানে না চাহিয়া ঐ শক্ত কঠিন নীরস সংসারকেই আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন, তার প্রত্যেক অনাবশ্যক খুঁটিনাটির উপর নিজের কিশোর চিত্ত উজাড় করিয়া।

এতখানি বাড়াবাড়ি করবার তাঁর প্রয়োজন ছিল না—অথচ এ-সব লইয়া বাদ-বিসম্বাদ যা চলিত, তা খুব গোপনে ! এ লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাঁচ-জনের সাম্‌নে কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে নামা ভালো দেখায় না ! রাগের মাথায় এটুকু ধৈর্য্য কোনো দিনই হারাই নাই।

স্ত্রীকে মিনতি জানাইলাম, দারুণ বিরহের আতঙ্ক জাগাইলাম, কিন্তু একটা অতি তরল লঘু হাস্যের ফুৎকারে আমার মিনতি আর শাসনটুকুকে উড়াইয়া তিনি চলিয়া গেলেন এক-গাদা বালিশের ওয়াড় শেলাই করিতে ! প্রয়োজন ছিল না—কারণ ওয়াড়ের পয়সা দর্জ্জীকে দিতে পারি এমন অবস্থা আমার খুবই ছিল। আর এ সংসারে তাই

হইয়া আসিতেছে চিরকাল। তবে সম্প্রতি দাদা একটা সিঙ্গার মেশিন আনাইয়াছিলেন, তাই স্ত্রীর এই বাড়াবাড়ি!

ভয়ঙ্কর রাগিয়া গেলাম। আমায় উপেক্ষা? অর্থাৎ আমি অত্যন্ত সুলভ, করতলগত,—তাই? এ নাম কিনিবার আগ্রহ শুধু—তাছাড়া আর কি! মার কাছে কথাটা পাড়িলাম। মা হাসিয়া বলিলেন,—ছেলে মানুষ, পাঁচটা কাজ শেখবার উৎসাহ আছে…!

হায়রে, মা শুধু এইটুকুই বুঝিলেন! পাঁচটা কাজ শেখা! আর এই জীবন-বসন্ত…এটা…

নিরাশ চিত্তে একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া শ্যামবাজারে গেলাম। সহরের দক্ষিণ সীমানা ছাড়িয়া একেবারে উত্তরে। ডেপুটিগিরি চাকরিটা শৃঙ্খল দিয়া পা আটকাইয়া রাখিয়াছিল, নহিলে সে ঝোঁকে হয়তো হিমালয়ের উদ্দেশেই পাড়ি দিতাম!

শ্যামবাজারের একটা পাড়ায় ছোট একখানি দোতলা বাড়ী ভাড়া লইলাম। খাট বিছানা, টেবিল চেয়ার, বইয়ের রাশ সব লইয়া সেখানে জড়ো করিলাম। বামুন রাখিলাম, চাকর রাখিলাম—সব ঠিক, কেবল স্ত্রীকে আনিলাম না। আনা সম্ভবও ছিল না।

বাড়ীর লোক এই সমারোহ দেখিয়া বলিল,—ব্যাপার কি?

আমি বলিলাম—বাড়ীতে দরদ পাই না কারো কাছে, নানান্ গোলমাল,—কিছু দিন আলাদা থাকবো।

মা বলিলেন—ছোট বৌমাকে নিয়ে যা—নইলে দেখবে কে! বুকের উপর একটা হাতুড়ির ঘা পড়িল। বলিলাম,—লোক আছে।

স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন,—ভাগ্যে সহরে বন নেই! তা এটা সীতার বন-বাস নয়—রামের সহর-বাস! নয়?

কট্‌মট্‌ করিয়া তার পানে চাহিলাম। দর্পিতা তরুণী,·· বাড়ীর লোকের বাহবা পাইয়া তুমি বড় ফাঁপিয়াছো! আচ্ছা, ভাখো এবার··· স্বামী একদিকে, আর সমস্ত জগৎ এক দিকে—কেমন থাকো!

স্ত্রী গ্রাহ্যও করিলেন না।···আমার মনে কত চিন্তাই যে তাল পাকাইতে লাগিল! প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ—ঠিক! উপায় নাই, ঐ চাকরিটা···চাকরির জন্যই এ দর্পের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লওয়া গেল না।

দশ বারো দিন পরে কাছারি হইতে ফিরিয়া পোষাক ছাড়িয়া উপরের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছি—খোলা জানলা দিয়া অনেকখানি খোলা আকাশ দেখা যাইতেছিল। ফিকা নীল আকাশের কোলে ক'টা পাখী উড়িতেছে, তাই দেখিতেছি—আর কি-এক বেদনায় মনটা থাকিয়া থাকিয়া ভারী হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় ঠিক বিদ্রূপের ভঙ্গীতে পাশেই কে বলিয়া উঠিল,—কি গো, নতুন ঘর সাজিয়ে কেমন আছো?

চমকিয়া চাহিয়া দেখি, স্ত্রী। ভাবিলাম, কেমন, আসিতে হইয়াছে তো! কোন জবাব দিলাম না।

স্ত্রী বলিলেন,—ঘরের ঘরণী কে গো?

এবার জবাব দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—আর কে এসেচে?

স্ত্রী বলিলেন,—মা এসেচেন, দিদি, আর ঠাকুরঝি—

—কোথায় তাঁরা?

—তাঁরা গেছেন পরেশনাথের বাগান দেখতে। তারপর সব থিয়েটারে যাবেন।

আমি বলিলাম,—তুমি যে পরেশনাথ দেখতে যাওনি ?

স্ত্রী বলিলেন,—সকলে খেয়ে থিয়েটারে যাবেন কিনা, তাই আমি খাওয়ার তদ্বিরে রয়ে গেলুম।

কাজ, কাজ—জ্বালাতন! গৃহকর্ম্মের তদ্বির করাই কি নারী-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য বুঝিয়াছ তুমি, নারী! স্বামীর প্রেম, তরুণ চিত্ত···এগুলা উপেক্ষার বস্তু ?

আমি বলিলাম—বেশ! আমি বেড়াতে যাচ্ছি।··তোমরা কি থিয়েটারের পর এখানেই ফিরবে ?

স্ত্রী বলিলেন,—মা তাই বলছিলেন।··আমাকে এখানে রেখে যাবেন।

আমি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলাম,—না, না, না—আরামে থাকতে এসেচি, এখানেও কেন আমার আরামে ব্যাঘাত করবে! তুমি যা নিয়ে সুখে থাকো, তাই নিয়ে আছো···দয়া করে আমাকেও সুখে থাকতে দাও··

স্ত্রী বলিলেন,—মার কথা তা বলে তো আমি ঠেলতে পারি না। কি করি, বলো ?

কি নির্ম্মম এই তরুণীর প্রাণ! মার কথা ঠেলিবে না, তাই দয়া করিয়া এখানে আমার পাশে ঠাঁই করিয়া থাকিবে! তোমার নিজের মন কি একবার একটা ক্ষোভের নিশ্বাস জাগায় না? বেদনার এতটুকু আভাস ? ··নিশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

অদৃষ্ট! বাহিরে মন টিঁকিল না। চলার ঝোঁকে একটা ট্রামে চড়িয়া বসিলাম—ট্রামখানা এস্প্লানেডে গেল। আমি নামিলাম না; সেই ট্রামেই আবার ফিরিলাম। মা, বৌদি, রাণী সবাই তখন ফিরিয়াছে। আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে সকলে থিয়েটারে যাইবে।

মা বলিলেন—ছোট বৌমা এখানেই থাকবে রে।

আমি বলিলাম,—না।

বৌদি বলিলেন—থাকবে না তো কি। আমরা ওকে নিয়ে যাবো না তো! ও থাকবে আলবৎ!

আমি বলিলাম—না।

রাণী বলিল—ছোট-দা, কি পাগলামি করচো?

আমি বলিলাম—না।

এতগুলা না'র পরও স্ত্রী থাকিয়া গেলেন। এ-সব ব্যাপার সত্ত্বেও লোকে বলে, নারী বাঙালীর সংসারে কেহ নয়, কিছু নয়? মিছা কথা! যাক্! মনটা একটু হাল্‌কা বোধ হইল। ভাবিলাম, এখানে তো কাজের ঘটা নাই, দেখি, এবারে বুঝি স্ত্রীর মন একমাত্র আমাকেই অবলম্বন কবিবে।

কিন্তু ভুল, ভুল! তিনি শুধু পাঁচ রকম খাবার তৈরী করায় মত্ত এবং বন্ধুবর্গকে ভোজ দিয়া খুশী। হায়রে, কত জ্যোৎস্না-রাত্রি আসে, আর এলোমেলো হাওয়ায় উদাস নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যায়, টবের গাছে ফুলের রাশ ফুটিয়া ওঠে, আবার অবহেলার মাঝে ঝরিয়া পড়ে, পাখীর দল ঝাঁক্ বাঁধিয়া গান ধরে, সে গান তখনি থামিয়া যায়—তবু এ তরুণীর মন আমার পানে ঝুঁকিবার অবসর খুঁজিয়া পায় না!

আমার রাগ ধরিত নিজের উপর, স্ত্রীর উপর, সকলের উপর! প্রতিশোধ লইবার দারুণ সাধ মনে জাগিত সর্ব্বক্ষণ,—কিন্তু মনটা কেমন দুর্ব্বল ছিল, স্ত্রীর মুখের পানে চাহিলেই দেখিতাম, কি এক ভাব, তার চোখের চাহনিতে নিরুপায়তার এক করুণ ছবি! পাষাণে কে যেন একখানি সুন্দর প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীকে যেমন পাইয়াছিলাম, পাওয়াটা তেমনি রহিয়া গেল!

অর্থাৎ সে-মনটুকুকে পাইলাম না! ঘর ছাড়িলাম যে-মন পাইবার জন্য,—ঘর ছাড়িয়াও সে-মন পাইলাম না!

এমনি ভাবে দিন যাইতেছিল। আমি যখন তাকে কাছে টানিতে চাই, সে তখন দূরে সরিয়া যায়; আবার আমি যদি দু'জনের মধ্যে একটু অবহেলার পাঁচিল তুলিয়া দি, তখন সে তার ফাঁকে ওই চোখ রাখিয়া এমন মিনতির দৃষ্টি হানে যে, দুই বাহু আমার নিমেষে উদগ্র হইয়া ওঠে! কিন্তু হায়রে, সে ঐ নিমেষের জন্য! ধরিবার জন্য সে বাহু বাড়াইলে আবার যে-ছায়া সেই ছায়া! ভাবিলাম, ঘর ছাড়িয়াও এ যে পাগল হইবার জো!

হঠাৎ একদিন ভবানীপুর হইতে খবর আসিল, রাণীর ছেলের অসুখ। কাছারি হইতে ফিরিয়া শুনিলাম, স্ত্রী ভবানীপুরে চলিয়া গিয়াছেন। রাগ ধরিল, অভিমান হইল,—আমায় ফেলিয়া সেই এক-রত্তি ছেলেটার সেবাই তার সর্ব্বস্ব! কেন, বাড়ীতে কি লোক ছিল না আর! এ শুধু নাম কিনিবার জেদ—আর কিছু নয়!

ঠাকুর আর চাকর বিষম গোল বাধাইয়া তুলিল। নিত্য বকাবকি—প্রাণ যাইবার জো! একদিন ঠাকুর বলিল,—বাজারে বড় খরচ হচ্ছে, অথচ জিনিষ তেমন আস্‌চে না। ঠাকুর আরো বলিল—আক্‌লু দস্তুরী চায়।

দস্তুরী! বটে! ঠাকুরকে বলিলাম, সে যেন বাজারে যায়!

পরদিন কাছারি হইতে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীতে কুরুক্ষেত্র বাধিয়াছে। আক্‌লু স্পষ্ট বলিল, ঠাকুর যদি বাজার করে তো তাকে অন্যত্র চাকরির চেষ্টা দেখিতে হইবে।

এ-কথাও সে স্পষ্ট খুলিয়া বলিল যে, একে তো বাড়ী হইতে তত্ত্ব-তাবাস লইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই—তার উপর যদি বাজার

করার কাজটা ফস্কাইয়া যায় তো সে সাত টাকা মাহিনায় চালাইবে কি করিয়া। গরীব মানুষ, দুই পয়সা রোজগারের জন্যই না সে কলিকাতায় আসিয়াছে।

আক্‌লুর এ সুস্পষ্ট স্পর্দ্ধা দেখিয়া জলিয়া উঠিলাম, বলিলাম,—বটে, তুমি চুরি করে ভূত্তিনাশ করবে, অথচ তোমায় রাখতে হবে।

আক্‌লু বলিল—জবাব দিন্।

জবাবই দিলাম। ঠাকুর নূতন ভৃত্য আনিল, পঞ্চম। তার দেখা পাওয়ার অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। তাছাড়া জুতায় কালি পড়ে না, ব্রশ পড়ে না, কাপড়গুলা কোঁচানো হয় না—কাছাবির পোষাক যেখানে রাখি, সেইখানেই পড়িয়া থাকে। শুইতে গিয়া নিজেকে মশারিও ফেলিতে হয়। চমৎকার।

পঞ্চমকে ডাকিলাম। সাড়া মিলিল না। ঠাকুরকে ডাকিলাম। ঠাকুর আসিয়া সংবাদ দিল, নূতন ভৃত্যের ভারী জ্বর। বেচারা ম্যালেরিয়ায় এমন ভুগিতেছে

রাগিয়া বলিলাম—তা পয়সা দিয়ে রুগীর সেবা করবো, এমন পয়সা আমার নেই। আমি তো দাতব্য হাসপাতাল খুলি নি, এখানে চাকরকে কাজ করতে হবে, শুয়ে সাবু খেলে চলবে না।

আর একটা চাকর আসিল, নারাণ। ফিটফাট বাবু-বেশ। একদিন দেখি, আমারি চিরুণী ব্রশ লইয়া নিজের মাথা আঁচড়াইতেছে। এ সাম্যবাদ অসহ্য ঠেকিল। তার কাণ ধরিয়া গালে ঠাশ করিয়া একটা চড় দিলাম—সে বিদায় হইয়া গেল। তারপর আবার নূতন চাকর—তার সঙ্গেও ঠাকুরের কলহ। রাত্রে বিছানায় শুইলাম। শুনিলাম, সে ঠাকুরকে বলিতেছে, মাছের মুড়ো রোজ তুই খাবি, আর আমি খাবো খালি কুচো চিংড়ী।

ঠাকুর বলিল—বাজার করতে হয় আমাকে,—খাবো না ?

সে বলিল—তুমি বাজার যাবে কেন ?

ঠাকুর বলিল,—তবে কি তুমি যাবে নাকি ! সেটি হচ্ছে না।

ভাবিলাম, বাঃ! এরা আমায় বেশ বেকুব পাইয়াছে তো! দুটোকেই তাড়াইলাম। ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জ্জন! আপদ গেল।

কাছারির ফেরত বাড়ী গেলাম। পরদিন ছিল রবিবার। মাকে বলিয়া আসিলাম—কাল রবিবার। দুটো চাকরকে পাঠিয়ো। দুপুর বেলা জিনিষপত্র নিয়ে আসবে। বাড়ী ফিরবো। ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছি।

রবিবাব। বেলা চারিটা বাজে—কোথায় কে! বাড়ী হইতে কেহ আসিল না। পাচটার সময় দুখানা গরুর গাড়ী ডাকাইলাম। মোট-ঘাট তার উপর চাপাইয়া বাহির হইব, এমন সময় ভবানীপুর হইতে ইন্দ্র চাকর আসিয়া হাজির। মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, আজ সুবিধা হইল না—জিনিষপত্র সোমবার লইয়া যাইবে। আজ যেন আমি একাই বাড়ী ফিরি। ইন্দ্র খালি-বাড়ীতে থাকিয়া চৌকি দিবে।

রাগে জ্বলিয়া উঠিলাম, ইন্দ্রকে বলিলাম,—তা হয় না। তুই চলে যা।

সে বলিল—গরুর গাড়ীর সঙ্গে যাই তা হলে ?

আমি বলিলাম,—না। তুমি ট্রামে বাড়ী ফেরো। তাকে ট্রামের পয়সা দিলাম।

গরুর গাড়ী ছাড়িল, তখন সন্ধ্যা ঠিক ছ'টা। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়া আমিও যাত্রা সুরু করিলাম। যত আস্তে চলি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী দুই খানা পিছাইয়া যায়। খানিক গিয়া আমি দাঁড়াইয়া থাকি,

গরুর গাড়ীকে আনেকটা আগাইয়া যাইতে দিই—তারপব ধীরে ধীরে চলি—তবুও গরুর গাড়ী যে পিছনে সেই পিছনে!

সেটা আষাঢ় মাস—তৃষ্ণায় আকণ্ঠ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম ঝরিতেছে, তবু এ চলার আর দাঁড়ানোর বিরাম নাই।

এমনি করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম,—রাত তখন বারোটা বাজে! দুই পা টাটাইয়া উঠিয়াছে—মাথা ঘুরিতেছে! বাড়ী পৌঁছিয়াই চীৎকার করিয়া বলিলাম,—এই তোমাদের জিনিষ-পত্তর। গাড়ী থেকে নামাতে পারো, নামাও—নাহলে যা হয় হোক্। আমার আব দাঁড়াবাব ক্ষমতা নেই!

আমি গিয়া একেবারে জামা খুলিয়া দোতলার বারান্দায় গা গড়াইয়া দিলাম। রাতের অত চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি··· সব কোথায় মিলাইয়া গেল।

··· ··· ··· ···

তারপব একরাশ ফাগুন হাওয়ার পরশ লাগিতে আরাম পাইয়া চোখ চাহিলাম। চাঁদের কি আলোই ফুটিয়াছে—জ্যোৎস্নার পাথার যেন।···পাশে স্ত্রী···শ্রান্ত ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্ত্রী কহিল,—এই সরবৎটা খেয়ে নাও · ছি ছি, এমন পাগলামিও করে!

স্ত্রীর চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন, মুখ মলিন, আর কণ্ঠের স্বব · বাজ্যের কি সান্ত্বনাই যে তাহাতে মিশিয়া···